জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২

স্মরণিকা

তামাকমুক্ত পরিবেশ

সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ

তামাকমুক্ত পরিবেশ,
সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২

স্মরণিকা

প্রকাশনা
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব জাহিদ মালেক এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধান পরামর্শক

ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ (স্মরণিকা উপ-কমিটি)

জনাব হোসেন আলী খোন্দকার সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল	আহ্বায়ক
জনাব নিলুফার নাজনীন অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
জনাব খন্দকার জাকির হোসেন উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
ডা. মিজানুর রহমান আরিফ লাইন ডাইরেক্টর, লাইফ স্টাইল, হেলথ প্রমোশন এন্ড হেলথ এডুকেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম টেকনিক্যাল এডভাইজর, দি ইউনিয়ন	সদস্য
ডা. মোঃ ফরহাদুর রেজা প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল	সদস্য
জনাব মো. মোখলেছুর রহমান প্রোগ্রাম ম্যানেজার, লাইফ স্টাইল, হেলথ প্রমোশন এন্ড হেলথ এডুকেশন এবং উপ-প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
জনাব আমিনুল ইসলাম সুজন প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল	সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

জুলাই'২০২২

প্রকাশনা

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

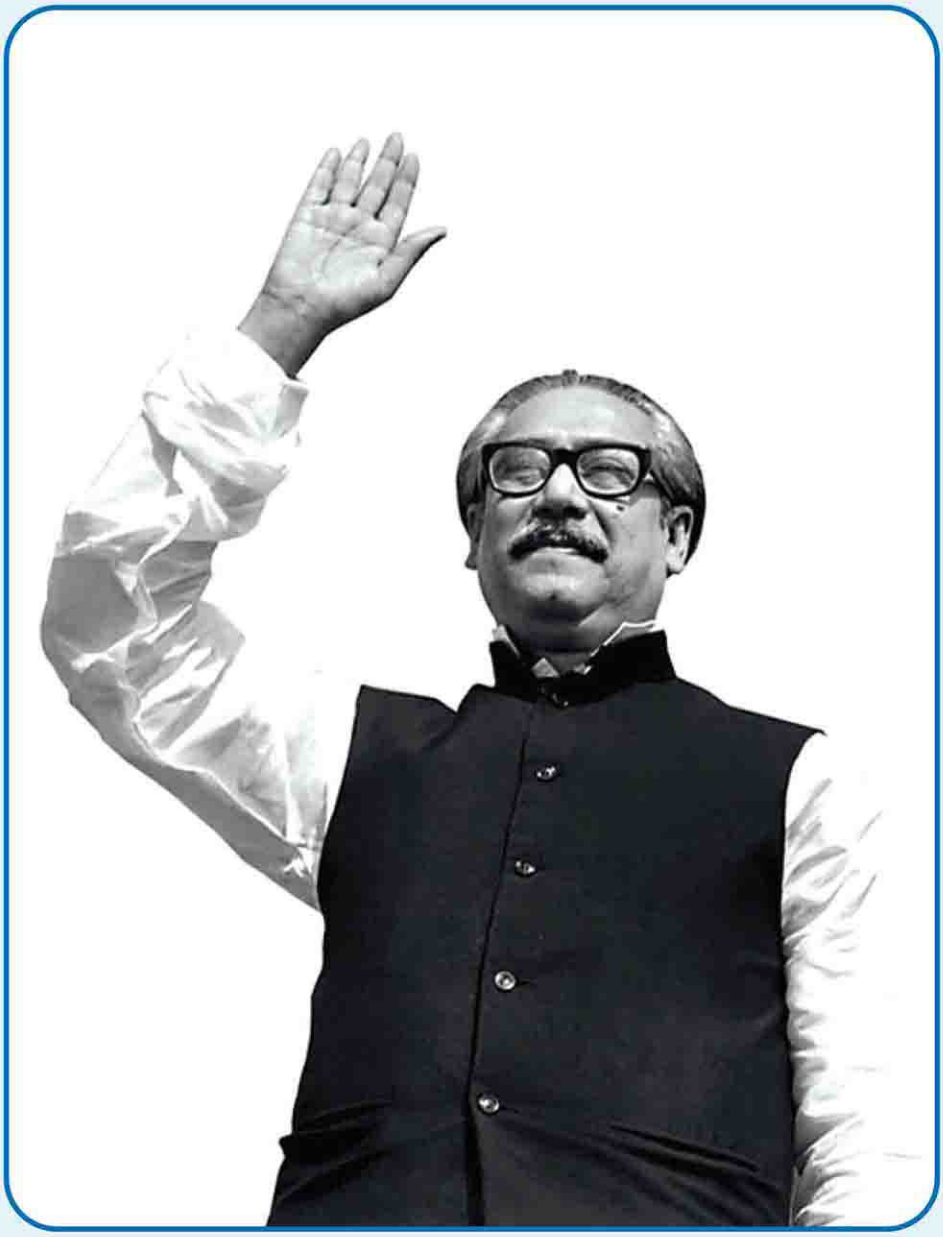

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩১ শে জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং Inter-Parliamentary Union আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় স্পীকার্স সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** ঘোষণা দিয়েছেন:

আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাই। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করছি, সেগুলো হচ্ছে:

- প্রথম পদক্ষেপে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহার করে একটি তহবিল গঠন করা, যা দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- দ্বিতীয় ধাপে, আমরা তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে, দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং একই সাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা।
- সর্বোপরি, আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সব ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের সাথে মিল রেখে আমরা আমাদের আইনগুলোকে FCTC 'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করব।

সূচিপত্রঃ

ক্রঃ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী	০৭
০২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী	০৯
০৩.	মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বাণী	১১
০৪.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর বাণী	১৩
০৫.	অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর বাণী	১৪
০৬.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর বাণী	১৫
০৭.	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ প্রতিনিধি'র বাণী	১৬
০৮.	সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর নিবন্ধ	১৭-১৯
০৯.	সম্পাদকীয়	২০
১০.	প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ এর শত্রু তামাক: মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ	২১-২২
১১.	বঙ্গবন্ধুর হাতেই স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু	২৩-২৬
১২.	পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় শতভাগ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা	২৭-২৯
১৩.	জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ জরুরি	৩০-৩২
১৪.	তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ	৩৩-৩৫
১৫.	পরিবেশ রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তায় তামাক চাষ বন্ধ করা প্রয়োজন	৩৬-৩৭
১৬.	তামাকজনিক ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ	৩৮-৪০
১৭.	তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিবৃত্তকরণ সেবাপ্রদান জরুরি	৪১
১৮.	পরিবেশ রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরুরি	৪২-৪৩
১৯.	পাবলিক পরিবহনে ধূমপান সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য করণীয়	৪৪-৪৫
২০.	তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা	৪৬-৪৭
২১.	কেন বিশ্বের অষ্টম শীর্ষ তামাক ব্যবহারকারী দেশ বাংলাদেশ?	৪৮-৫০
২২.	Cultural acceptance of smokeless tobacco deserves countercultural measures*	৫১-৫৪
২৩.	Importance of a Tobacco Tax Policy in Bangladesh	৫৫-৫৭
২৪.	Importance of a Comprehensive Social and Behavior Change Communication Campaign in Making Bangladesh Tobacco-free by 2040	৫৮-৫৯
২৫.	Tougher Tobacco Control Law is Essential For A Tobacco Free Bangladesh	৬০-৬১
২৬.	Smoke free environment: Basic human rights	৬২-৬৪
২৭.	অঙ্গিকার (কবিতা)	৬৫
২৮.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫	৬৬-৭৮
২৯.	আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, কার্টন, কৌটায় মুদ্রণের জন্য অনুমোদিত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সমূহ	৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
৩১ মে ২০২২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ধূমপান ও তামাক সেবন প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। পরিবেশের ওপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব আরও ব্যাপক। তামাকজনিত কারণে পরিবেশ ধ্বংসের বিষয়টি তুলে ধরে এ বছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য ' Tobacco: Threat to our environment '- যার ভাবানুবাদ 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি।

কৃষি জমিতে তামাক চাষ ও কাঁচা তামাক পাতা চুল্লিতে আগুনের তাপে শুকানো, কারখানায় বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য উৎপাদন এবং সবশেষে ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য সেবন পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তামাক পাতা চুল্লিতে শুকানো ও সিগারেট তৈরির জন্য বনজ সম্পদ ধ্বংস হয় এবং চুল্লির আশপাশের বায়ু মারাত্মক দূষিত হয়। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। তামাক সেবন ও ধূমপানের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হাঁপানিসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ধূমপানকে বলা হয় মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। তামাক সেবন ও ধূমপানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ধাবিত হয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তামাক ও ধূমপান বর্জন সুস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' এর সংশোধন এবং ২০১৫ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা' প্রণয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান ও তামাকের ভয়াল নেশা থেকে সরিয়ে আনতে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যমকে সমন্বিত প্রয়াস চালাতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো – এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ জৈষ্ঠ ১৪২৯
৩১ মে ২০২২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- ' Tobacco: Threat to our environment ', 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবন পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ৩০০টি সিগারেট তৈরির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ কাটা পড়ছে। তামাক চাষ ও তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রতিবছর গড়ে ২ লক্ষ হেক্টর বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী তামাক চাষের কারণে শতকরা ৫% হারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। তামাকজনিত কারণে ১৯৭০ সাল হতে অদ্যাবধি ১৫০ কোটি হেক্টর (প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয়) বন বিলুপ্ত হয়েছে যা বার্ষিক ২০% গ্রীণহাউজ গ্যাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

তামাক সেবন তথা ধূমপান, জর্দা ও গুলের ব্যবহার প্রাণঘাতী নেশা। তাছাড়া পরোক্ষ ধূমপানও অধূমপায়ীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। গবেষণায় জানা গেছে, তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন: হৃদরোগ, ক্যান্সার, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে বছরে ৮০ লক্ষাধিক ও বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ব্যবহারকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' (এফসিটিসি) প্রণয়ন করেছে। এফসিটিসি'র আলোকে ২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'-এর সংশোধন করা হয়েছে। জাতিসংঘ তামাককে উন্নয়নের হুমকি বিবেচনায় নিয়ে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এসডিজি) প্রণয়ন করেছে। বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুক্ত করেছে। সর্বোপরি, দক্ষিণ এশীয় স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এ আমি আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছি। সে লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন একটি সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠী। এজন্য মানুষকে ধূমপান ও তামাকের ভয়াল নেশা থেকে দূরে রাখতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার ক্রমশ কমিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা। তামাক সেবনের কোন সুফল নেই- মানুষের কাছে এই বার্তা নিয়ে যেতে হবে। এজন্য সরকার, বেসরকারি সংগঠনসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একসঙ্গে কাজ কাজ করতে হবে।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ্।

আমি 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০২২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও প্রতিবছর 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' উদ্‌যাপন করে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে ' Tobacco: Threat to our environment '- যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'। তামাক এমন একটি উদ্ভিদ যার মধ্যে কোন উপকারী উপাদান নাই। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭,০০০ রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, এর মধ্যে ৭০টি মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। ধূমপানের সময় এসব রাসায়নিক বাতাসকে দূষিত করে তোলে যা অধূমপায়ীদেরও মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

সিগারেটের ফিল্টার ও মোড়কে মাইক্রোপ্লাস্টিক, জর্দা-গুলের প্লাস্টিক মোড়ক এবং ই-সিগারেটে ধাতব কয়েল, ব্যাটারি ও প্লাস্টিক উপাদান রয়েছে। এগুলো দীর্ঘদিন পরিবেশে বিদ্যমান থেকে মাটি ও পানি দূষণসহ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। পৃথিবীতে প্রতিবছর তামাকজাত পণ্য হতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে। জর্দা বা সাদাপাতাসহ যারা পান খায় তারা যত্রতত্র পানের পিক থুথু আকারে ফেলে থাকেন, এতে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। পানের পিকের সঙ্গে কোভিড-১৯, যক্ষ্মাসহ সংক্রামক রোগের অসংখ্য জীবানু বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, তামাক চাষে জড়িত কৃষক ও শ্রমিকগণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতিদিন ৫০টি সিগারেটের সমপরিমাণ নিকোটিন গ্রহণ করে থাকে। এতে গ্রীন টোব্যাকো সিকনেস দেখা দেয়; ফলে অনিদ্রা, খাবারে অনীহা, মাথা ব্যাথা, ঝিমুনি ভাব, বমি/বমিভাব ও চর্মরোগ ইত্যাদিসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া, তামাক চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিকের সংস্পর্শে স্নায়ুবিক সমস্যা, রক্তের সমস্যা এবং টিউমারসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। তামাক চাষে জড়িতদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জিনগত পরিবর্তন ও জন্মগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তামাক চাষে জড়িত শিশুদের কিডনির সমস্যা হতে পারে এবং পরবর্তীতে এসব শিশুর বড়ো অংশ তামাকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। অন্যান্য স্বাস্থ্যক্ষতির পাশাপাশি গর্ভবতী নারীর সন্তানের ক্ষতি ও সন্তান ধারণে সমস্যা দেখা দেয়।

বিড়ি-সিগারেটের মাধ্যমে ধূমপান, পানের সঙ্গে জর্দা ও তামাক পাতা এবং মাড়িতে গুল ব্যবহার ইত্যাদি সব ধরনের তামাকই মরণব্যাধি হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, হাঁপানিসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ সৃষ্টি করছে। ফলে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তামাকজনিত রোগে বাংলাদেশে ১ লাখ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। অধিকন্তু, বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে, কোভিড-১৯ মহামারির তীব্রতা ও মৃত্যুর সঙ্গে ধূমপান ও তামাক ব্যবহারের সম্পর্ক রয়েছে। ধূমপানের কারণে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ধূমপান ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে বিধায় ধূমপায়ীদের মধ্যে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের মৃত্যুঝুঁকি ১৪ গুণ বাড়িয়ে দেয়। তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যখাতে তামাক নিয়ন্ত্রণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সরকার ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সংশোধন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এসডিজিভুক্ত এফসিটিসি বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে সরকার ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার সামিটে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ তৈরিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে অবশ্যই তামাকমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আমি আশাবাদী।

আসুন, আমরা সকলে মিলে একটি তামাকমুক্ত পরিবেশ গড়ে সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ নিশ্চিত করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৩১ মে তারিখে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৈশ্বিক ইংরেজি প্রতিপাদ্য 'Tobacco: Threat to our environment' এর ভাবানুবাদ হিসাবে বাংলায় 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য-কে তুলে ধরে এ দিবসটি দেশের সকল জেলা-উপজেলায় উদ্‌যাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সহায়তায় দিবসটি গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপন করায় আমি জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনগণ, উপজেলায় নির্বাহী অফিসার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জানাই। এ ধরণের সমন্বিত উদ্যোগ দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নকে জোরালো করবে। এসব পদক্ষেপ সার্বিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের বাণী এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের লেখা সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।

তামাক একটি মারাত্মক নেশাদ্রব্য। তামাক থেকে উৎপাদিত বিড়ি-সিগারেট, জর্দা-গুল ইত্যাদি সকল পণ্যই মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। বিশেষ করে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭০০০ এর বেশি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যার মধ্যে ২৫০টির অধিক মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ৭০টির অধিক রাসায়নিক মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ধূমপায়ীর ধোঁয়ার কারণে শিশু-নারীসহ অধূমপায়ীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হলে তাদেরও ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি দেখা দেয়। গবেষণা দেখা গেছে, তামাক সেবন, ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ ও ডায়াবেটিস ইত্যাদি প্রাণঘাতী বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়। তন্মধ্যে ১২ লক্ষাধিক শিশু-নারীসহ অধূমপায়ী ব্যক্তি, যারা দীর্ঘদিন পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে মারা যায়।

টোব্যাকো এটলাস শিরোনামের আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের কারণে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ও অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাক খাত থেকে আয়ের চেয়ে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশি। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, ধূমপান কোভিড-১৯ সংক্রমণে সহায়ক এবং ধূমপায়ীদের মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। ধূমপানের কারণে শ্বাসতন্ত্রের নানাবিধ সংক্রমণের এবং শ্বাসজনিত রোগ তীব্র হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ধূমপায়ীর মৃত্যুঝুঁকি প্রায় ১৪ গুণ বেশি।

তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনাসহ তামাকজনিত বৈশ্বিক মহামারী নিয়ন্ত্রণে প্রণীত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' (FCTC) তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির আলোকে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর সংশোধনী পাস করেছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র ৩নং অভিলক্ষ্যে এফসিটিসি বাস্তবায়নকে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা প্রদান করেছেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্যে অর্জন সম্ভব হবে বলে মনে করি।

ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও কর্মসূচি পরিচালক
ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ৩১ মে তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ' Tobacco: Threat to our environment ' এর বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'।

বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল, সাদাপাতা সেবনের কারণে মানুষের শরীরে হৃদরোগ, ক্যান্সার, স্ট্রোক, সিওপিডি, এজমা, ডায়বেটিসসহ প্রাণঘাতী অনেক অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায় (দি টোব্যাকো এটলাস ২০১৮)। তামাক শুধু মানুষকে মৃত্যুর দিকেই ধাবিত করে না, পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র-জলবায়ুর উপরও ভয়াবহ তামাকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তামাক পৃথিবীকে দিনে দিনে বিষাক্ত থেকে বিষাক্ততর করে তুলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতে, প্রতি ৩০০টি সিগারেট তৈরির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ এবং বিশ্বব্যাপী সিগারেট তৈরির জন্য প্রতিবছর ৬০ কোটি গাছ কাটা পড়ছে। একটি সিগারেট থেকে ১৪ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এবং সার্বিকভাবে তামাক উৎপাদনে বৈশ্বিক আবহাওয়া-তে প্রায় ৮ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টন CO_2 বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭,০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে।

তামাকের রাসায়নিক ও তামাক চাষে ব্যবহৃত কীটনাশক, তামাকজাত পণ্যের প্লাস্টিক মোড়ক, সিগারেটের ফিল্টার ও ই-সিগারেটের প্লাস্টিক কার্টিজসহ যন্ত্রাংশ বায়ু, পানি ও মাটি দূষিত করছে। এতে মাটি ও পানিনির্ভর জীববৈচিত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক চাষ মাটির উর্বরতা শক্তি কমায়। তামাক চাষে অনেক পানির ব্যবহার হয়। মাত্র একটি সিগারেটের জন্য ৩.৭ লিটার পানি ব্যবহার হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে তামাক চাষে কারণে মরুময়তা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী, জলাশয়ের পানিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সিগারেটের ফিল্টার (বাট), এসব ফিল্টার মাইক্রো-প্লাস্টিক পণ্য ও মারাত্মক বিষাক্ত। এসব ফিল্টার থেকে নিকোটিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পানি ও প্রতিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীর বর্জ্যের বড়ো একটি অংশ, প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন তামাকজাত পণ্য হতে উৎপন্ন হয়।

এছাড়া ই-সিগারেটের ধাবত কয়েল, প্লাস্টিক কাট্রিজ, ব্যাটারি ও যন্ত্রাংশ এবং জর্দা, গুলসহ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের প্ল্যাস্টিক মোড়ক পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। যারা জর্দা-গুলসহ পান খায় তারা যত্রতত্র পানের পিক ফেলায় পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। পানের পিকের সঙ্গে কোভিড-১৯, যক্ষ্মাসহ সংক্রামক রোগের শতশত জীবানু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ সরকার সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণা বাস্তবায়নে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ চলমান রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩% তামাক সেবন করে (গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭)। নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ও পুরুষের মধ্যে ধূমপানের হার অনেক বেশি। দরিদ্রদের মধ্যে দু'ধরনের তামাক ব্যবহারই বেশি। তামাক সেবনকারীদেরকে তামাকের নেশা থেকে দূরে রাখতে পারলে সুস্থ জাতি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজ গতিশীল হবে। এতে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনারবাংলা' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

আসুন, আমরা তামাকসহ সকল নেশা থেকে দূরে থাকি। গড়ে তুলি তামাকমুক্ত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

কাজী জেবুন্নেছা বেগম

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Tobacco: Threat to our environment' এর বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'।

বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭,০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ২৫০টি রাসায়নিক মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ৭০টির অধিক মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ফলে কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে বা বাসা বাড়িতে কেউ ধূমপান করলে সেখানকার বাতাসে ৭০০০ ক্ষতিকর রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ে। শিশু, নারীসহ অধূমপায়ীগণ সেখানে থাকলে তারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ ও ডায়বেটিসসহ ইত্যাদি অসংক্রামক রোগ দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে অনুরূপ রোগব্যাধি হয়।

বাংলাদেশে প্রায় ৬৭ ভাগ মৃত্যু হয় বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে এবং এসব রোগের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন। তামাক শুধু অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যুর জন্যই দায়ী নয়, বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্তদের মৃত্যুঝুঁকিও বৃদ্ধি করে। যেমন ফুসফুসে যক্ষ্মা ও কোভিড-১৯ অন্যতম। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করতে গিয়ে দেখা গেছে, ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীদের চাইতে বেশি হারে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায়ও এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে।

এসডিজি অর্জনের পথ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে গুরুত্বসহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। যারা তামাক সেবন বা ধূমপান করেন তাদের সবার প্রতি অনুরোধ নিজের ও পরিবারের সুস্থতার জন্য আজই তামাক ছাড়ুন, বর্জন করুন ধূমপান। পাশাপাশি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ফুসফুসের ক্ষতি কমাতে নিজ গৃহ ও কর্মস্থলকে তামাকমুক্ত ও ধূমপানমুক্ত রাখুন।

অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

World Health Organization
Bangladesh

Message

Every year on 31 May the World Health Organization (WHO) and its partner organizations observe the World No Tobbaco Day (WNTD) intending to raise awarness of the harmful effects of tobacco use on health, environment economy, and society; and to advocate for effective policies to reduce tobacco consumption. "Tobacco: Threat to our envionment" is the theme of World No- Tobacco Day this year. This year's campaign is focused on the environmental impact of tobacco - from cultivation, production, distribution, and waste.

The campaign is also aimed at exposing the tobacco industry effort to "greenwash" its reputation and products by marketing itself as environmetntally friendly. But with an annual green house gas contribution of 84 mega tons of carbon dioxide equivalent the tobacco industry contributes heavily to climate change. Globally, arround 3.5 million hectares of land are destroyed for growing tobacco, contributing to deforestation, especially in the developing world.

Reducing tobacco consumption is not only related to good health and health related goals but needs to be identified as a critical lever for achieving many other Sustainable Development Goals. Threfore, the campaign calls on govrnments and plicymakers to enact legislation, including implementing and strengthening existing schemes to make producers responsible for tobacco product waste's environmental and economic costs.

World Health Organization (WHO) Bangladesh stands ready to provide essential technical assistance to the Government of Bangladesh on this.

Dr. Bardan Jung Rana
WHO Representative to Bangladesh

অতিরিক্ত সচিব সমন্বয়কারী
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২
'তামাকমুক্ত পরিবেশ : সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'

তামাক একটি উদ্ভিদজাত ভেষজ পণ্য যার মধ্যে ব্যাপক ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে। তামাকের উৎপাদন (চাষ ও চুল্লিতে তামাক পাতা শুকানো), প্রক্রিয়াজাতকরণ (কারখানায় ধূমপানের উপাদান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক তৈরি) ও সেবন (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন)- যার সব প্রক্রিয়াতেই জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

তামাক ব্যবহার বিশ্বে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭,০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ২৫০টি রাসায়নিক মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ৭০টির অধিক রাসায়নিক মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। হৃদরোগ, স্ট্রোক, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ (সিওপিডি, এজমা), ডায়বেটিস, বার্জাজ রোগসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে সারাবিশ্বে বছরে ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে ১২ লক্ষাধিক অধূমপায়ী পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, যার অধিকাংশই শিশু ও নারী (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৯)। তামাকজনিত রোগে মৃত্যুসংখ্যা ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, এইচআইভি/এইডস এর সম্মিলিত মৃত্যুর চাইতেও বেশি।

তামাক ও পরিবেশ: ধূমপান তিন রকমের ক্ষতিকর গ্রীণ হাউজ গ্যাস উৎপন্ন করে, যেমন: কার্বন ডাই অক্সাইড , মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড যা একইসঙ্গে ঘরের বাতাস ও বায়ুমন্ডলকে দূষিত করে। এছাড়া বাংলাদেশে পানের সঙ্গে সাদাপাতা ও জর্দার বহুল প্রচলন রয়েছে। পান সেবনকারীগণ যত্রতত্র পানের পিক ফেলায় পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। পানের পিকের সঙ্গে কোভিড-১৯, যক্ষ্মাসহ সংক্রামক রোগের শতশত জীবানু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

তামাক ও বনজ সম্পদ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি ৩০০টি সিগারেট তৈরির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ এবং বিশ্বব্যাপী সিগারেট তৈরির জন্য প্রতিবছর ৬০ কোটি গাছ কাটা পড়ছে। বিশ্বব্যাপী তামাক চাষ ও তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রতিবছর গড়ে ২ লক্ষ হেক্টর বন ধ্বংস হচ্ছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয় তন্মধ্যে শুধু তামাক চাষের কারণে ৫% বন ধ্বংস হয়।

তামাকজনিত কারণে ১৯৭০ সাল হতে অদ্যাবধি ১৫০ কোটি হেক্টর (প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয়) বন বিলুপ্ত হয়েছে যা বার্ষিক ২০% গ্রীণহাউজ গ্যাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী। বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকজাত দ্রব্য বাতাসসহ ওজন পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। একটি সিগারেট থেকে ১৪ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এবং সার্বিকভাবে তামাক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৈশ্বিক আবহাওয়া-তে প্রায় ৮ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টন CO_2 বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

তামাক ও খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে খাদ্য নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তামাক চাষ বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। তামাক চাষ মাটির উর্বরতা শক্তি কমায়। ফলে তামাক চাষের পর কৃষি জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করা ব্যয় সাপেক্ষ।

তামাক, মাটি ও পানি: প্রকৃতিতে মাটি, পানি ও বায়ু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তামাকের রাসায়নিক ও তামাক চাষে ব্যবহৃত কীটনাশক মাটি ও পাশ্ববর্তী জলাশয়ের পানি দূষণ করছে। এতে মাটি ও পানির পরিবেশ-প্রতিবেশ দূষিত হচ্ছে, মাটি ও পানিনির্ভর জীববৈচিত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। একটি হিসাবে দেখা গেছে, মাত্র একটি সিগারেটে উৎপাদনের জন্য জন্য ৩.৭ লিটার পানি প্রয়োজন হয়। এ হিসেবে বলা যায় যায়, গড়ে একজন ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ৭৪ লিটার পানির অপচয় রোধ করতে পারেন। সার্বিকভাবে, তামাক চাষে পৃথিবীতে দুই হাজার দু'শত কোটি লিটার পানির ব্যবহার হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী, জলাশয়ের পানিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সিগারেটের ফিল্টার (বাট), এসব ফিল্টারে ব্যবহৃত মাইক্রোপ্লাস্টিক পানি দূষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি করছে। এসব ফিল্টার থেকে নিকোটিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পানিতে ও প্রতিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠান এনভায়রনমেন্টাল

প্রটেকশান এজেন্সি (EPA) এর তথ্যানুযায়ী, সিগারেটের ফিল্টার যদি ৯৬ ঘন্টা মিঠা পানিতে থাকে তাহলে মিঠাপানির অর্ধেক মাছ মারা যেতে পারে।

তামাকজনিত বর্জ্য: পৃথিবীতে উৎপাদিত বর্জ্যের বড় একটি অংশ অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন তামাকজাত পণ্য হতে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি (৪,৫০,০০০,০০,০০,০০০) সিগারেটের ফিল্টার/উচ্ছিষ্ট এভাবে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। একইভাবে জর্দা, গুলসহ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যও প্লাস্টিক মোড়কে বাজারজাত করা হয়। এগুলো থেকেও বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে।

ই-সিগারেট ও ই-বর্জ্য: বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। এজন্য বিভিন্ন দেশে ইলেকট্রনিক সিগারেট নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENDS), ভ্যাপ বা ভ্যাপরের প্রচলনকে দায়ী করা হচ্ছে। ই-সিগারেট নামে বহুল প্রচলিত এসব সিগারেটের ধাতব কয়েল, প্লাস্টিক কার্ট্রিজ, ব্যাটারি ও যন্ত্রাংশ পরিবেশের ওপর রূঢ় প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে, প্লাস্টিক কার্ট্রিজগুলো একবার ব্যবহার করা হয় এবং এগুলো যত্রতত্র ফেলে দেওয়ার পর জলাশয়, মাটিসহ প্রতিবেশ-পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘদিন অক্ষত থেকে যায়।

তামাক চাষ ও জনস্বাস্থ্য: তামাক চাষে জড়িত কৃষক ও শ্রমিকগণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতিদিন ৫০টি সিগারেটের সমপরিমাণ নিকোটিন গ্রহণ করে থাকে। এতে গ্রীণ টোব্যাকো সিকনেস দেখা দেয়, ফলে অনিদ্রা, খাবারে অনীহা, মাথা ব্যাথা, ঝিমুনি ভাব, বমি/বমি ভাব, চর্মরোগ ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া তামাক চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিকের সংস্পর্শে স্নায়ুবিক সমস্যা, রক্তের সমস্যা, টিউমারসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া তামাক চাষে জড়িতদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জিনগত পরিবর্তন ও জন্মগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তামাক এবং শিশু ও নারী: শিশু ও নারীদের মধ্যে যারা তামাক চাষ, তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও তামাকজাত পণ্য উৎপাদনে জড়িত তাদের ওপর তামাকের প্রভাব আরও ব্যাপক। শরীরের পাতলা চামড়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে তাদের শরীরে নিকোটিন প্রবেশ করে। গ্রীণ টোব্যাকো সিকনেস শিশু-নারীদেরও হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুদের কিডনির সমস্যা হতে পারে এবং এসব শিশুর বড়ো অংশ পরবর্তীতে তামাকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। তামাক চাষে জড়িত নারীদের অন্যান্য স্বাস্থ্যক্ষতির পাশাপাশি গর্ভবতী নারীর সন্তানের ক্ষতি ও সন্তান ধারণে সমস্যা দেখা দেয়।

তামাক মাদক সেবনের প্রবেশ দ্বার: তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামে একটি মারাত্মক নেশা সৃষ্টিকারী রাসায়নিক রয়েছে। মূলত এই নিকোটিনের প্রভাবেই একজন ধূমপায়ী বা তামাকসেবনকারী ক্রমশ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। তামাকের এ আসক্তি অন্যান্য মাদকের আসক্তির মতই ভয়াবহ। নিকোটিন আসক্তির কারণে একজন ধূমপায়ী বা তামাকসেবী সহজে এ নেশা ছাড়তে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে, ধূমপান হচ্ছে নেশাজগতের প্রবেশ দ্বার। ধূমপানের মাধ্যমে কিশোর-তরুণেরা নেশা শুরু করে। পরে মাদকসহ অন্যান্য নেশায় ধাবিত হয়। মাদকের নেশা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে। ধূমপান ও তামাকের নেশা কমিয়ে আনতে পারলে মাদকের নেশা কমিয়ে আনা সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

এসডিজিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ: এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে তামাককে না বলুন। জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় (এসডিজি) সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে অসংক্রামক রোগজনিত অকালমৃত্যু এক তৃতীয়াংশ হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর বাস্তবায়নকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। দারিদ্র দূরীকরণ, জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, কৃষি জমির সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা এবং পরিবেশ বান্ধব স্বাস্থ্যকর শহর/নগরসহ এসডিজির প্রায় প্রতিটি উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

তামাক ও কোভিড-১৯: গত কয়েক বছরে কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেসব দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে তন্মধ্যে ধূমপান ও তামাক পরিহার অন্যতম। বিড়ি-সিগারেটের ফিল্টার হাত দিয়ে ঠোঁটে নিতে হয়, যা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া ধূমপান ফুসফুস ও শ্বাসনালীর ক্ষতি করে কিভাবে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়া রোগীদের মৃত্যুঝুঁকিও অনেক বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন গবেষণার আলোকে জানিয়েছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুঝুঁকি বেশি।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে তামাকের নেশা: তামাকের নেশা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে-যা আত্মহত্যার শামিল। এজন্য ইসলাম ধর্মে তামাক ও ধূমপানের নেশাকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থ ব্যয় করে বিড়ি-সিগারেট বা তামাক পণ্য ক্রয় অপচয় হিসাবে গণ্য এবং সকল অপচয়কে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে নেশাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন: 'তিনি তোমাদের জন্য পবিত্র ও ভালো (তাইয়েবাত) বস্তু হালাল করেন আর ক্ষতিকর ও নোংরা (খাবায়িস) বস্তু হারাম করেন' (আয়াত ১৫৭, সুরা আল-আরাফ)। ধূমপান নিশ্চয়ই খাবায়িস এর অন্তর্ভুক্ত, তাই ধূমপান করা বৈধ (হালাল) নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন, 'তোমরা নিজেদের জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন করো না' (আয়াত ১৯৫, সুরা আল বাকারা)। এ আয়াতের বাণীতেও ধূমপান নিষেধ হওয়ার বিষয়টি

অনুধাবন করা যায়। কারণ ধূমপানের কারণে অনেক জীবন বিধ্বংসী রোগব্যাধি হয়ে থাকে। আল্লাহ আরও বলেছেন, 'তোমরা অপচয় করো না। অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' (আয়াত ২৭, সুরা আল-ইসরা)। ধূমপান একটি অপচয়, যা মানুষের রোগ ও মৃত্যুর জন্য দায়ী। এ বিবেচনায়ও ধূমপান নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্বনবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদিস থেকে জানা যায়, 'সকল নেশাসৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম'। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১৮০ হাদীস, ৩৫৭৬)। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রা.) থেকে বর্ণিত 'যে বস্তু অধিক পরিমাণে গ্রহণ নেশা সৃষ্টি করে তা সামান্য পরিমাণে গ্রহণও আল্লাহ'র রাসুল (সা.) নিষিদ্ধ করেছেন' (সুনানে নাসারী, হাদীস: ৫৬০৮, ৫৬০৯, সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস: ৫৩৭০)।অতএব সকল প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী তামাক ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে তামাকের ভয়াবহতা: তামাক ব্যবহারজনিত রোগ ও মৃত্যু বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে ধূমপানের ক্ষেত্রে বিড়ি-সিগারেট এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকের ক্ষেত্রে পানের সঙ্গে সাদাপাতা/আলাপাতা, জর্দা বা দোক্তা মাড়িতে গুল ইত্যাদির ব্যবহার বেশি। ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭অনুযায়ী ৩৫.৩% বা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষ (৪৬% পুরুষ ও ২৫.২% নারী) তামাক সেবন করে। ১৮% বা ১ কোটি ৯২ লক্ষ মানুষ (পুরুষ ৩৬.২% ও নারী ০.৮%) ধূমপান করে এবং ২০.৬% বা ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ (পুরুষ ১৬.২% ও নারী ২৪.৮%) ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে। ৪৪% প্রাপ্তবয়সি বা ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ গণপরিবহণে, প্রাপ্তবয়সি চাকুরিজীবীদের ৪২.৭% বা ৮১ লক্ষ মানুষ কর্মস্থলে এবং ৪ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ বাসায়/গৃহ-অভ্যন্তরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর বৈশ্বিক গবেষণা প্রতিবেদন টোব্যাকো এটলাস ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর এক লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে মারা যায়।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও ক্যান্সার রিসার্চ-ইউকে'র যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, সরকার সব তামাক থেকে যত রাজস্ব পায়, তার চাইতে অনেক বেশি অর্থ তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়, এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, ত্রিশ বা তদুর্ধ্ব বয়সিদের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৭০ লাখের অধিক প্রাপ্তবয়সি লোক তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে ১৫ লক্ষাধিক বা ২২% মানুষ তামাক সেবনজনিত হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুস ক্যান্সার, স্বরযন্ত্রেরক্যান্সার ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার, শ্বাসযন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা (সিওপিডি, এজমা) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত। এছাড়া ১৫ বছরের কমবয়সি শিশুর মধ্যে ৪ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিশু তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, যার মধ্যে ৬১ হাজারের অধিক শিশু বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে এফসিটিসিতে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এফসিটিসির'র আলোকে ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাস এবং ২০১৫ সালে বিধি জারি করেছে। ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটে ৫০% স্থানে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা মুদ্রণ করা হচ্ছে। এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্বসহ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২: পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জলবায়ুর উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে এ বছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: ' Tobacco: Threat to our environment' - যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'।

দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক-নির্দেশনামূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী দিয়েছেন। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীও এ দিবস উপলক্ষ্যে এক বাণীর মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

শেষ কথা: ধূমপান ও তামাক ব্যবহার একটি মারাত্মক নেশা। তামাকের মধ্যে নিকোটিন রয়েছে, যার আসক্তি অন্যান্য মাদকের চাইতে শক্তিশালী। তাই ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করুন, তার আগ পর্যন্ত অন্তত অধূমপায়ীর সামনে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণ এবং বাসা-বাড়িতে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নে সহায়তা করুন।

আসুন, আমরা নিজেকে ও পরিবারকে ভালোবাসি। প্রাণঘাতী নেশা তামাক ও ধূমপান বর্জনের মাধ্যমে নিজেকে ও দেশকে তামাকজনিত মহামারি থেকে রক্ষা করি।

হোসেন আলী খোন্দকার

সম্পাদকীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) অংশে অনুচ্ছেদ ১৮: জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা -এর ১৮।(১) -এ বলা হয়েছে: জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধানকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কতর্ব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নীতি বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে আইন ও নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ। তামাক সেবন, ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপান ফলে মানুষের মধ্যে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস, সিওপিডিসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের জন্য দায়ী। তামাক সেবনের কারণে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকার আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এর আলোকে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করেছে। সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিসি) অর্জনকে গুরুত্ব প্রদানসহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে গুরুত্বসহ অন্তর্ভূক্ত করেছে।

সরকার তথা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধীনস্ত সংস্থা, জাতীয়-জেলা-উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, বিভাগীয়-জেলা-উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এগিয়ে নিতে সমগ্র পৃথিবীতে ৩১ মে তারিখে উদযাপিত হয় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। বাংলাদেশেও দিবসটি গুরুত্বসহ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। তন্মধ্যে জাতীয় গণমাধ্যমে ক্রোড়পত্র প্রকাশ অন্যতম। এতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধির বাণী এবং সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) -জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর লেখা রয়েছে। ক্রোড়পত্রে ব্যবহৃত এসব লেখা এই স্মরণিকায় ব্যবহার করা হয়েছে। এতে স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এতে সাধারণের মাঝে স্মরণিকাটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এছাড়া স্মরণিকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। স্বল্পতম সময়ে লেখা প্রেরণ করার জন্য লেখকগণকে ধন্যবাদ জানাই। স্মরণিকাটি প্রকাশে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মহোদয়ের পরামর্শ অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) সহ সংশ্লিষ্ট সকলে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ স্মরণিকা প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ করেছে, এজন্য সংস্থাটির সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল।

স্মরণিকাটি তথ্যবহুল, বৈচিত্রময়, সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করতে সম্পাদনা পরিষদ সচেষ্ট থেকেছে। তবে ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। একইসঙ্গে তথ্যগত কোন ভুল নজরে আসলে তা আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। এছাড়া যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের স্মরণিকা প্রকাশে সহায়ক হবে।

প্রকাশনা উপ-কমিটির পক্ষে

হোসেন আলী খোন্দকার
আহ্বায়ক-স্মরণিকা উপ-কমিটি
ও সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

আমিনুল ইসলাম সুজন
সদস্য সচিব-স্মরণিকা উপ-কমিটি
ও প্রোগ্রাম অফিসার
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের শত্রু তামাক: মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আব্দুল মালিক

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

সাবেক উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছে গেছে। অর্থনীতি, সামাজিক অনেক সূচকেই দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। কোভিড-১৯ এর সময়ে বিভিন্ন খাতে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। কিন্তু আমাদের উন্নয়নযাত্রায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে হৃদরোগ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো নানা অসংক্রামক রোগ। কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবশ্যই জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, সুস্থ মানুষের শ্রমের বিনিময়েই দেশ সমৃদ্ধ হয়। এজন্যই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) লক্ষ্য ৩-এ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের জীবনাচরণ বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, কায়িক শ্রমের অভাব ইত্যাদি কারণে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রোগের পিছনে একটি বড় কারণ তামাক ব্যবহার। বাংলাদেশে পৌনে চার কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। বিপুল পরিমাণ তামাক সেবনের ফলও ভয়াবহ। প্রতিবছর দেশে তামাকজনিত রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায় এবং বছরে ৪ লাখ লোক হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়। (টোব্যাকো অ্যাটলাস)

অন্যদিকে তামাক ব্যবহারের ফলে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ও উৎপাদনশীলতা নষ্ট হওয়ার কারণে প্রতিবছর দেশে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হচ্ছে। তামাক খাত থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়, তার তুলনায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। এছাড়া তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাকপণ্য উৎপাদন, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, বিড়ি/ সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশগত ক্ষতি রয়েছে। সামগ্রিকভাবেই তামাক জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্য বড় একটি হুমকি।

তামাকপাতা শুকানো-প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে বিড়ি-সিগারেট ও জর্দা-গুল উৎপাদন এবং সেবন-প্রতিটি স্তরেই তামাক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণেরও কারণ। তামাক শুকানোর জন্য প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়। এক একর জমিতে যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয় এটি শুকানোর জন্য প্রয়োজন প্রায় ৬ টন কাঠ। এই বিপুল পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন মেটাতে একরের পর একর বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে।

বনভূমি ধ্বংসের পাশপাশি তামাক চাষের ফলে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদও দূষিত হয়। তামাক চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। উর্বরতা বৃদ্ধি এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রচুর পরিমাণ সার ও কীটনাশক গড়িয়ে নদীর পানিতে গিয়ে মেশে। তামাক চাষে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক সার ও বালাই নাশক প্রয়োজন হয়। তামাক চাষে জমির উর্বরতা হ্রাসের কারণে সারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হয়, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। অন্যদিকে বিড়ি-সিগারেট তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রতিনিয়ত বাতাসকে দূষিত করে চলেছে। সিগারেটের ফিল্টার বা মোথা, প্যাকেট এবং কার্টুন থেকে যে বর্জ্য তৈরি হয় তা পরিবেশের ক্ষতি করে। বাংলাদেশে প্রতিবছর বিড়ি-সিগারেটের বর্জ্য হিসেবে প্রায় ৫০ হাজার টন বাট ও প্যাকেট পরিবেশ দূষিত করে। সিগারেটের বাট দশ বছর পর্যন্ত মাটিতে থাকলেও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। সিগারেটের বাটে আর্সেনিক, লেড এবং নিকোটিন থাকে, যা মাটিতে মিশে পরিবেশ দূষণের কারণ হয়। পানিদূষণের অন্যতম উৎস সিগারেটের ফিল্টার।

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে তামাক একাধারে আমাদের প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের শত্রু। এর কোনো উপকারিতা নেই। আর্থিক, স্বাস্থ্যগত কিংবা পরিবেশ-সবদিক থেকেই এটা চরম ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয় স্পিকার সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়েছিলেন, আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার। তিনিই বিশ্বের প্রথম কোন রাষ্ট্রপ্রধান যিনি এমন ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি শুধু দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণাই দেননি, বরং এই লক্ষ্য অর্জনে করণীয় সম্পর্কেও আলোকপাত করেছিলেন।

তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'প্রথম পদক্ষেপে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহার করে একটি তহবিল গঠন করা-যা দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে, আমরা তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং একইসাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি, আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সব ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের সাথে মিল রেখে আমরা আমাদের আইনগুলোকে FCTC'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করব।'

তাঁর এই বলিষ্ঠ ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ ও অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে কার্যক্রম চালাতে হবে। বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত তিনটি নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এর পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকে সচেতন করা, পাঠ্যপুস্তকে তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভূক্ত করা, তামাক ছাড়তে সহায়তার ব্যবস্থা করা, তামাকের পরিবর্তে অন্য ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা, তামাক শ্রমিকদের অন্য কোনো ঝুঁকিমুক্ত পেশায় নিয়োজিত করা, তামাকের উপর কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও চাহিদা কমানো প্রভৃতি পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার, শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একা দেশকে তামাকমুক্ত করতে পারবে না। এজন্য স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, তথ্য, বাণিজ্য, কৃষি, পরিবেশ-সকল মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগ নিলে এবং দল-মত নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে অবশ্যই আমরা বাংলাদেশকে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করতে পারবো।

বঙ্গবন্ধুর হাতেই স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু

-অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

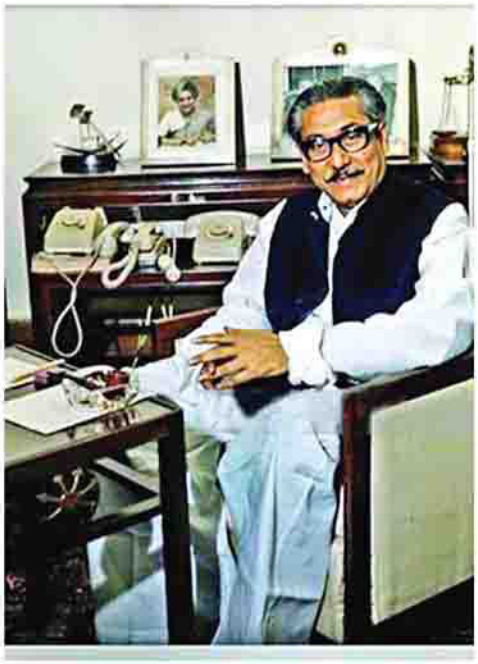

ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্বে যিনি অদ্বিতীয়; অত্যাচারীদের সম্মুখে যিনি অভেদ্য ঢাল; যিনি অসহায়, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির দিশারী ও আশা-ভরসার স্থল; দেশপ্রেম, সাম্যবাদ, আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা যাঁর হৃদয়ে চির জাগ্রত; স্বাধীনতার স্বপ্ন যাঁর মননে সার্বক্ষণিক আচ্ছাদিত; সমস্ত মেধা যাঁর চির মানব কল্যাণে নিবেদিত, জীবন-যৌবন সর্বস্বই যাঁর দেশ ও দেশের মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত, দু'চোখে স্বপ্ন যাঁর উন্নত সুখী, সমৃদ্ধ, কল্যাণকর, সকল নাগরিকের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় একটি নতুন দেশ প্রতিষ্ঠা করা ও এমনই একটি বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নদ্রষ্টা এক মহান বিশ্ব নেতার কথা বলছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় যিনি অনন্য, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার লড়াইয়ে যিনি চির লড়াকু সেই মহান নেতার কথা বলছি। আমি বলছি, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় গভীরভাবে বিশ্বাসী, গণমানুষের মুক্তির সংগ্রামের এক অগ্রদূতের কথা। আমি বলছি, এক মহামানবের কথা, আমি বলছি, এক স্বপ্নদ্রষ্টার কথা, আমি বলছি, আজীবন সংগ্রামী অকুতোভয় এক বীরের কথা, আমি বলছি, নির্ভীক অসীম সাহসী এক মানুষের কথা, আমি বলছি, নির্লোভ, সৎ একজন মানুষের কথা, আমি বলছি, গণমানুষের এক নেতার কথা, আমি বলছি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জনগণকে ভালোবেসে যাওয়া এক নেতার কথা, আমি বলছি, মৃত্যুর পরেও জনগণের ভালবাসায় বেঁচে থাকা মৃত্যুঞ্জয়ী এক নেতার কথা, আমি বলছি, শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত -অত্যাচারিত মানুষের জন্য মুক্তি পাগল এক নেতার কথা, আমি বলছি, একটি জাতিকে নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাস্তবায়ন ও দেশ গড়ার এক মহান নেতার কথা, আমি বলছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর কথা। আমি বলছি, চির সংগ্রামী এক মহামানবের স্বপ্ন জয়ের হার মানানো রূপকথার মহানায়ক বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। যিনি অবাস্তবকে বাস্তবে, কল্পনাকে বিশ্ববাসীর সামনে রূপদান করে চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যিনি ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ লুৎফর রহমান এবং শেখ সায়েরা খাতুনের কোল আলোকিত করে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেদিনের খোকাই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রধান রূপকার ও কারিগর। বর্তমান বাংলাদেশকেও বঙ্গবন্ধুরই নির্দেশিত পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন- যা সমগ্র বাঙালির জন্য যেমন পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তেমন-ই পরম প্রাপ্তি।

বঙ্গবন্ধুর জীবন যেমন সংগ্রামী তেমনি বৈচিত্র্যময়, কতো না ঘটনা প্রবাহ, রচিত হয়েছে কত সাফল্য গাথা ইতিহাস। শৈশব জীবনে বঙ্গবন্ধু খেলাধুলা খুবই পছন্দ করতেন। কিশোর জীবনে তিনি ফুটবল খেলায় অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলর এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে নিজের জীবন বাজি রেখে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন রক্ষা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধুরই প্রস্তাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর রয়েছে অসামান্য অবদান। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের পূর্বপাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয় লাভ করে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ এককভাবে ১৪৩টি আসনে জয়ী হয় এবং বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ আসন থেকে বিজয়ী হন। ১৯৫৫ সালে সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামকরণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ৬৯-এর গনঅভুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ–সবই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৬৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু, উপাধি দেওয়া হয়। উপাধি ঘোষণা দিয়েছিলেন বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জ্যেষ্ঠ নেতা সাবেক শিল্পমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ। এ সভায় দেয়া বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর

৫৫ বছরের জীবনে কোনো অপরাধ না করেও শুধু জনগণের অধিকার আদায়ে লড়াই করার জন্য ১৩ বছরেও অধিক সময় জেল খেটেছেন। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে বারবার জেল খেটেছেন কিন্তু দমে যাননি। গরীব-দুঃখী-অসহায়-শোষিত-বঞ্চিতসহ সকল শ্রেণির মানুষ, সকল পেশার মানুষ, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসীসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে হাজারো বাধা, জেল জুলুমের মধ্যেও একটি মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত হননি। সমগ্র জীবন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা বঙ্গবন্ধুর জীবনযাপন ছিল সাধারণ মানুষের মতোই। বিরাট হৃদয়ের অধিকারী বঙ্গবন্ধু ছিলেন সফল ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই সফলভাবেই সম্পন্ন হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় একটি জাতি হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে, একজন জনগণের নেতা হিসেবে সবসময় স্বপ্ন দেখতেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার। যে রাষ্ট্রের চরিত্র হবে অসাম্প্রদায়িক, প্রতিষ্ঠিত হবে বাঙালি জাতিসত্তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় থাকবে। মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না। ধর্ম ভিত্তিতে নয়, দেশের নাগরিক হিসেবে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। থাকবে না ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। প্রত্যেক নাগরিক তার মৌলিক অধিকার, মাতৃভাষার অধিকার, সুচিন্তিত মুক্ত চিন্তার মত প্রকাশসহ তার নিজ নিজ অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করবে। এমনই একটি অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ উন্নত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সবসময়ই বিরাজমান থাকতো। বঙ্গবন্ধুর এমন স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিশ্বের ইতিহাসে মহানায়কে পরিণত করেছে। যে কারণে তার রাজনৈতিক জীবনকে জেল জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, মৃত্যুভয়, ষড়যন্ত্রসহ কোনো বাধাই টলাতে পারেনি। মাতৃভাষার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ৬ দফা বাস্তবায়নের আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কিংবা ১৯৭০ সালের নির্বাচন, সবশেষে ৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙ্গালি জাতির মুক্তির ও অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু হাজির হয়েছেন মুক্তির বার্তা নিয়ে। লক্ষ-কোটি জনতার সামনে দাঁড়িয়েছেন আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে অকুতোভয় বীর হিসেবে। সমগ্র জাতিকে সাহস জুগিয়েছেন। কান্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজে অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে আলোর দিশারী হয়ে সমগ্র জাতির চরম দুর্দিনে দিশা দিয়েছেন। অমৃতময় মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও দর্শন কী অপূর্ব, কতনা বৈচিত্র্যপূর্ণ, বর্ণাঢ্য, আন্দোলন-সংগ্রামে পরিপূর্ণ, অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়।

বঙ্গবন্ধুর হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু:

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে গবেষণার জন্য তৎকালীন আইপিজিএম এন্ড আর-কে গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০০ থেকে ৫০০ বেডে উন্নীত করেন।

বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক দূরাবস্থার মধ্যেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গবেষণার জন্য তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন দেশে ছিল মোট আটটি মেডিকেল কলেজ। প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে তিনি অধ্যাপকের পদসহ বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের স্বাস্থ্য ভাবনা ও পদক্ষেপসমূহের কিছু কথা উল্লেখ করছি। দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশন, পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশন, সাথে সাথে মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণার প্রত্যেকটা বিষয়ে জাতির পিতার অবদান রয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষার ডিগ্রীগুলো ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল একে একে স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়। এর ফলে আমাদের দেশ থেকে ইংল্যান্ডে গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা লাভের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। জাতির পিতা তখন অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে ১৯৭২ সালে একটা প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স অব সার্জন্স (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠা করেন। যারা পাকিস্তান থেকে এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করেছেন, যারা বিদেশ থেকে এমআরসিপি, এফআরসিএস করেছেন, এ ধরণের ৫৪ জন ফেলো নিয়ে বিসিপিএস-এর যাত্রা শুরু। জাতির পিতা বিসিপিএস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করে বর্তমানে ৬০০০ মত ফেলো দেশে ও বিদেশে কাজ করছেন। ৩০০০ হাজারের মত চিকিৎসক এমসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করে দেশে কাজ করেছেন– এটা দেশের পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতির পিতার অনন্য অবদান বলে আমি মনে করি। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ডাঃ আর জে গার্ষ্ট কে আমন্ত্রণ জানান এবং অর্থপেডিক সার্জারি বিষয়ে ট্রেনিং এর জন্য একটি টিমকে পূর্বজার্মানী প্রেরণ করেন। উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়াসহ পঙ্গু হাসপাতালে অর্থোপেডিক সার্জারির উপরে এমএস ডিগ্রী চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এভাবে দেশে তিনি অর্থোপেডিক সার্জারির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করেন। তাছাড়া পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার ক্ষেত্রে আইপিজিএম এন্ড আর-কে (বর্তমানে শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে শাহবাগে শিফট করা হয় তখন শয্যা সংখ্যা ছিল ৩০০টা। জাতির পিতা এটা আরো বৃদ্ধি করে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর বর্তমানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগের উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু তখন আইপিজিএম এন্ড আর-এর তৎকালীন ডাইরেক্টর প্রফেসর ডা. নুরুল

ইসলামকে বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য চিকিৎসকরা এত বেশি শাহাদাৎ বরণ করেছেন, আর কোনো পেশার লোক স্বাধীনতার জন্য এত বেশি শাহাদাৎ বরণ করে নাই। প্রফেসর ইসলাম আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে সকল শিক্ষক, চিকিৎসক শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাঁদের নাম লিখে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করুন। প্রফেসর ইসলাম সাহেব সেই মহতী কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। ৮৯ জন চিকিৎসক দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মহুতি দিয়েছিলেন। জাতির পিতা চিকিৎসকদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) বঙ্গবন্ধুর সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের শেষে দিকে দেশের ৭টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর করা হয়। অবশ্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদের তৎকালীন সহ-সভাপতি জাহিদুল হাসান এর নেতৃত্বে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনসহ অন্যান্যদের সাথে আমিও মিছিল করেছিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু বললেন, এক বছরও হয় নাই আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, এর মধ্যেই মিছিল করেছে, এরা কারা? বঙ্গবন্ধু তখন তৎকালীন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মরহুম আব্দুর রাজ্জাককে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মালেক উকিলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আমিও সেখানে ছিলাম। ওই সময় জাতির পিতার নির্দেশে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ৩ মাসের মধ্যে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের একটি পরিত্যক্ত ভবনে বেসিক সায়েন্সে এমবিবিএস চালু হয়।

জাতির পিতার চিন্তা-চেতনা, আমাদের চিন্তা চেতনার চাইতে বহুগুণে এডভান্স ছিল। বঙ্গবন্ধু তখন একটা রেফারেল সিস্টেম-এর কথা বলেছিলেন। প্রতিটি গ্রাম বা ওয়ার্ডে একজন স্বাস্থ্যকর্মী থাকবেন। যে স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে মানুষের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিবেন। অসুস্থ লোক থাকলে তাকে চিহ্নিত করে ইউনিয়ন সাব সেন্টারে নিয়ে যাবেন। সেই ইউনিয়ন সাব সেন্টারে একজন ডাক্তার থাকবেন, একজন নার্স থাকবেন, একজন প্যারামেডিক থাকবেন এবং সেখানে রোগীকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করতে না পারলে রোগীকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠাবেন। থানা কমপ্লেক্সে রোগী সুস্থ না হলে তাকে মহকুমা হাসপাতালে বা জেলা হাসপাতালে বা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। এভাবে একটি রেফারেল সিষ্টেমের কথা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন। জাতির পিতা বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন সাবজেক্ট, সাবস্পেশালিস্ট সাবজেক্ট পর্যন্ত তিনি চালু করেছেন। প্রফেসরের পদ তৈরি করেছেন। ১৯৭৩ সালে তিনি কার্ডিও ফিজিওলজি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ইউনিয়নে সাব সেন্টারসমূহ ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ যাতে নির্ধারিত সময়ের (১৯৭৮) মধ্যেই তৈরি হয় সেভাবেই পরিকল্পনা করেছিলেন। কারণ ইউনিয়নে সাব সেন্টারসমূহ ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ যথাসময়ে তৈরি হলে দেশের সকল মানুষকে চিকিৎসাসেবার আওতায় আনা সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধু ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৮ সালে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জাতির পিতা দেশের জনগণের জন্যই শাসনতন্ত্র তৈরি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু দেশকে প্রতিষ্ঠা ও শত্রু মুক্ত করে যাননি; মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা–অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কতটা জনকল্যাণমুখী ছিলেন বর্তমান সময়েও আমরা তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। বঙ্গবন্ধুর কনসেপ্ট বা চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা নিয়েই আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক খুলেছেন। এ কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার চেষ্টা করছি। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধুর পথ ধরেই জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের মেডিকেল শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫টি, সরকারী মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৩৮টি, এর মূলে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদান। বর্তমানে যখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য অধ্যয়ন করছেন, চিকিৎসাসেবা প্রদান করছেন, শিক্ষাদান করছেন তখন বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা খুবই মনে পড়ে। কারণ বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পদক্ষেপের ফলে আজকে মেডিক্যাল শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার এতটা উন্নতি সম্ভব হয়েছে। দেশের মেডিকেল শিক্ষার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান চির স্মরণীয় ও অনস্বীকার্য। জাতির পিতা ১৩ বছরের বেশি সময় ধরে জেল খেটেছেন। আমরা জাতির পিতার ত্যাগকে একটু অনুধাবন করে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাকে যেনো আরো গুরুত্ব দেই; সাথে সাথে চিকিৎসকদের অন্যান্য মহতী কর্মগুলোও যেন নিষ্ঠার সাথে পালন করি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর দুই নয়নে তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের স্বপ্ন। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পুনর্গঠন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলেই বাংলাদেশের সব উন্নয়নের ভিত রচিত হয়। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ও নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও দেশীয় রাজাকার কর্তৃক নির্মম নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার ক্ষতচিহ্ন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবে বিশ্বনেতারা এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা দিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে আশঙ্কা ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, ত্রাণ কার্যক্রম, স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক পদক্ষেপ, ভারতীয় বাহিনীর সদস্যদের ভারতে ফেরত পাঠান, ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনা, ১৯৭৩ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি, অবকাঠামোর উন্নয়ন, খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রথম

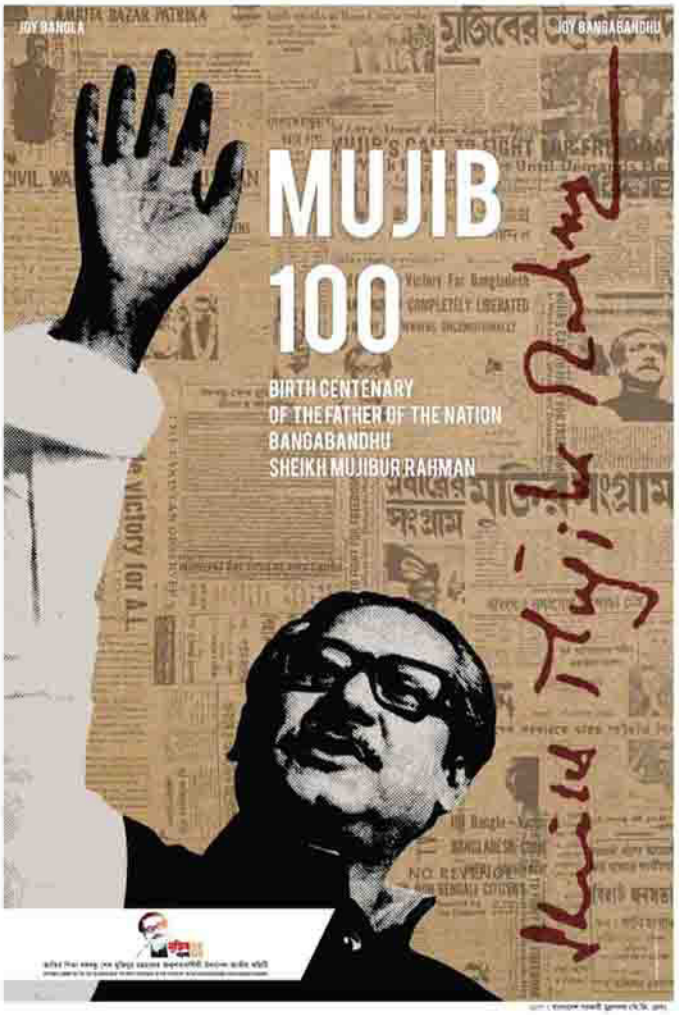

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বৈরী মনোভাব নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা, ইন্টারন্যাশানাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল এক্ট জারি, বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন শিক্ষা কমিশন গঠন, যমুনা সেতু নির্মাণের সূচনা, বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ ও গ্রহণ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পুনর্গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, কৃষিঋণ মওকুফ করণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫০০ ডাক্তারকে গ্রামে নিয়োগ, থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গঠন, বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে বাংলাদেশ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড়ায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু গৃহহীন মানুষের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭২ সালের জুন মাসে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার ঘোষিত ৫০০ কোটি টাকার প্রথম বাজেটের কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়। তারপরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে। শিশুদের জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে শিশু খাদ্য সরবরাহের উপর কর আরোপ করেননি। বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ বিতরণ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দেশের বড় সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ পুনর্নির্মাণ করেন। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন ও ভাঙ্গা জাহাজ অপসারণ করেন। শিল্পখাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী শিল্পঋণ প্রদানে নীতিমালা গ্রহণ করেন। পরমাণু শক্তি কমিশন, বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, শিল্প ঋণ সংস্থা, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে ৪ হাজার ৫শত ৫৫ কোটি টাকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পানাও ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য জাতিসংঘ ৪ শত ১১ কোটি টাকা এবং ভারত সরকার ২ শত ৫৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে শিল্প উন্নয়নেও বড় ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবকাঠামোর শক্তিশালী ভিত তৈরি করেন। কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন, নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা, বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নসহ সকল দিক থেকেই মাত্র সাড়ে তিন বছরেই বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হন।

পরিশেষে বলতে চাই, যে মহান নেতার জন্য একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই দেশকে সকল দিক থেকে পুনর্গঠন করে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন–সেই বঙ্গবন্ধুকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এমন কি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ তাঁর পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে আমরা হারিয়েছি। এটা আমাদের সব চাইতে বড় ব্যর্থতা। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই একটি অসাম্প্রাদায়িক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হত। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আমাদের সবচাইতে বড় সম্বল বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বর্তমান বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ব দরবারে ব্যাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। সে কারণেই রাষ্ট্র পরিচালনা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার বিকল্প নাই।

পরিশেষে একথা জোর দিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশ যতদিন থাকবে বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে, জনগণের মনের মণিকোঠায় বঙ্গন্ধ ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা চির অমর হয়ে বেঁচে থাকবেন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। চিরজীবী হউক মহান মুক্তিযোদ্ধার চেতনা। চির জাগ্রত থাকুক, অনির্বান শিখার মতো জ্বল জ্বল করুক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। সবশেষে বাংলাদেশের জন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর সাথে শাহাদাৎ বরণকারী সকল শহীদদের প্রতি আমার অন্তরের ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় শতভাগ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা

কাজী জেবুন্নেছা বেগম

অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও
কর্মসূচি পরিচালক, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

তামাক এক প্রাণঘাতী ও সর্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষতিকর পণ্য। তামাকের উৎপাদন (চাষ ও চুল্লীতে তামাক পাতা শুকানো), প্রক্রিয়াজাতকরণ (কারখানায় ধূমপানের উপাদান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক তৈরি) এবং ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন- সব প্রক্রিয়াতেই জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধূমপান, পরোক্ষ ধূমপান ও তামাক সেবনের কারণে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমনারি ডিজিজ (সিওপিডি, এম্ফাইসিমা ও এজমা), ডায়াবেটিসের মত অসংক্রামক রোগে পৃথিবীতে ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যায় ১২ লক্ষ অধূমপায়ী, যার অধিকাংশই শিশু ও নারী (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৯)। শুধু বাংলাদেশেই তামাকজনিত রোগে বছরে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায় (টোব্যাকো এটলাস ২০১৮)।

তামাকের মধ্যে রয়েছে ক্ষতিকর নিকোটিন, যা মানুষের মধ্যে মারাত্মক নেশা সৃষ্টি করে। এজন্য কেউ একবার আসক্ত হয়ে পড়লে সহজে ছাড়তে পারে না। ধূমপানের মাধ্যমে তরুণরা নেশার জগতে প্রবেশ করে। পরে অন্যান্য মাদকের নেশায় ধাবিত হয়। মাদকাসক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল ও ই-সিগারেটের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তবে এ লেখায় বিশেষভাবে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক ও পরোক্ষ ধূমপান থেকে অধূমপায়ীদের সুরক্ষায় শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এর গবেষণার আলোকে ইউএস সার্জন জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-এ বলা হয়েছে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় সাত হাজারের (৭,০০০) বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। তার মধ্যে ২৫০টি রাসায়নিক মারাত্মক ক্ষতিকর, যেগুলো মানবদেহে বিভিন্ন রোগব্যাধি সৃষ্টির জন্য দায়ী। ৭০টির অধিক রাসায়নিক মানবদেহের বিভিন্ন অংশে প্রাণঘাতী ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে। গবেষণায় জানা গেছে, যারা ধূমপান করে তাদের অর্ধেকই ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে ও ধুঁকে ধুকে মারা যায়। ধূমপানের ফলে যেসব প্রাণঘাতী রোগ বেশি হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ), হার্ট এটাক (হৃদরোগ), শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি, যার মধ্যে রয়েছে এম্ফাইসিমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস ইত্যাদি), শ্বাসনালীর দীর্ঘমেয়াদী রোগ (যেমন: হাঁপানি), বার্জাস ডিজিস ইত্যাদি।

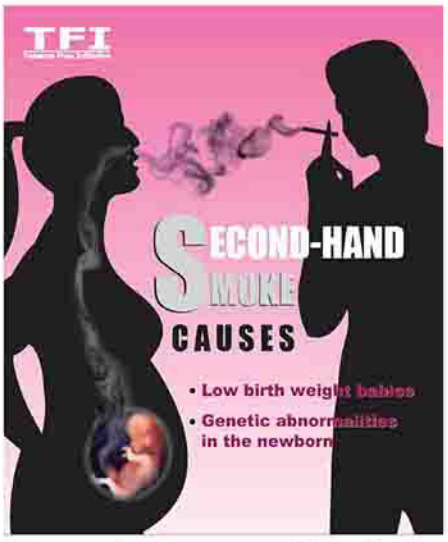

গবেষণায় জানা গেছে ধূমপান করলে যেসব রোগ হয়ে থাকে দীর্ঘদিন পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হলে অধূমপায়ীদেরও অনুরূপ প্রাণঘাতী রোগ ও অকালমৃত্যু হতে পারে। এজন্য বাসা, অফিস, বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুরি। কারণ, ধূমপায়ীগণ ধোঁয়ার সামান্য অংশ নিজেরা গ্রহণ করেন, ধোঁয়ার বড় অংশই বাইরে ছাড়েন। এজন্য বাসা, অফিস, বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে কেউ ধূমপান করলে বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় অধূমপায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হন। বিশেষ করে, নারী ও শিশু বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হন। কারণ শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। তাই পরোক্ষ ধূমপানের ফলে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানিসহ সিওপিডিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। গবেষণায়ও বিষয়টি প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পরোক্ষ ধূমপানের শিকার নারীরাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। বিশেষ করে, নারী সন্তান ধারণ প্রক্রিয়ার মারাত্মক ক্ষতি করে এবং গর্ভজাত সন্তানেরও ক্ষতি করে। গর্ভবতী নারী যদি পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয় তাহলে অকাল গর্ভপাত, কম ওজনের শিশুর জন্মদান বা মৃত সন্তান প্রসবের ঝুঁকি দেখা দেয়। এতে গর্ভজাত শিশুর জিনগত সমস্যাও দেখা দেয়।

ইউএস সার্জন জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৬-এ বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুস ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগসহ অনেক রোগ হয়ে থাকে। টোব্যাকো কন্ট্রোল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে (Secondhand smoke exposure and risk following the Irish smoking ban: an assessment of salivary cotinine concentrations in hotel workers and air nicotine levels in bars) বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপদ অবস্থা নেই। একমাত্র সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশই অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপানের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। এছাড়া ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় (Effect of smoke-free workplaces on smoking behavior: systematic review) বলা হয়েছে, ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হলে ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার রিসার্চ এর যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ২৬ হাজার মানুষ প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করে, যাদের অধিকাংশ শিশু। বাংলাদেশে শুধু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রত্যক্ষ ব্যয় (স্বাস্থ্যসেবায় ব্যক্তিগত ও সরকারি ব্যয়) এবং পরোক্ষ ব্যয় (অসুস্থ্যতা/অক্ষমতা ও অকাল মৃত্যুর কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি) ৪,১৩০ কোটি টাকা। এতে আরও বলা হয়েছে, ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মধ্যে ৪ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিশু তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এদের প্রায় সকলেই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। তন্মধ্যে ৬১ হাজারের অধিক শিশু বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০০৩ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) আর্টিকেল ৮-এ পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এফসিটিসিতে সকল অভ্যন্তরীণ/আচ্ছাদিত জনসমাগমস্থল (কর্মস্থল) সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স অব পার্টিস (সিওপি) এফসিটিসির আর্টিকেল ৮ বাস্তবায়নে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন প্রণয়ন করে। এফসিটিসির চাহিদা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আর্টিকেলসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০০৮ সালে গৃহীত এমপাওয়ার (MPOWER) পলিসি প্যাকেজ নীতির P-তে Protect people from tobacco smoke (পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব থেকে অধূমপায়ীদের সুরক্ষা প্রদান) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে: "রেস্টুরেন্টসহ আচ্ছাদিত সব জনসমাগমস্থল ও কর্মস্থলে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা"।

অধূমপায়ীদের সুরক্ষায় বাংলাদেশে বিদ্যমান 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' (২০১৩ সালে সংশোধিত) -এ ধারা ২(চ) এ **পাবলিক প্লেস** ও ২(ছ) এ **পাবলিক পরিবহনের** সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

পাবলিক প্লেস অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

পাবলিক পরিবহন অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান।

বাংলাদেশ গার্ল গাইড্স এসোসিয়েশন এর তামাক বিরোধী একটি প্রশিক্ষণ শেষের ছবি, মে ২০২২

এছাড়া 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'-এর ৪।(১) নং বিধি অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা হয়েছে:

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে, (গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, (ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে, (ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, (চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে, (ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট, (জ) শিশুপার্ক, (ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান, (ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন' ইত্যাদি (বিধি ৪);
ধারা-৪ এ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইন অমান্য করে ধূমপান করলে অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ড ধার্য করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

(১) কোন ব্যক্তি পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করতে পারিবেন না।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ড দন্ডণীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডণীয় হইবেন।

২০১৩ সালে সংশোধিত 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' ধারা-৮ এ পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

(১) প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইরেজি ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ড দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'-এর ৮।(খ)-তে সতর্কবাণীর সাইজ, (গ)-তে সতর্কবাণীর লেখা ও তলদেশের রং এর বর্ণনা এবং (ঘ)-তে নমুনা জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' (২০১৩ সালে সংশোধিত) প্রতিপালনে কোন কোন ক্ষেত্রে ধূমপায়ীদের শিথিলতা লক্ষ্যণীয়। ধূমপান যেহেতু মারাত্মক ক্ষতিকর নেশা তাই এ নেশার জন্য অনেকেই পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে অধূমপায়ীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। **গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭** অনুযায়ী ৪৪% প্রাপ্তবয়সী বা ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ গণপরিবহনে, প্রাপ্তবয়সী চাকুরিজীবীদের ৪২.৭% বা ৮১ লক্ষ মানুষ কর্মস্থলে এবং ৪ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ বাসায়/গৃহ-অভ্যন্তরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। **গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে ২০১৩** অনুযায়ী ৩১.১% শিশু বাসায়/গৃহ-অভ্যন্তরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। এছাড়া ৬১.৩% ছেলে ও ৫৪.৮% মেয়ে বিভিন্ন আবদ্ধ পাবলিক প্লেসে/পরিবহনের ভিতরে (যেমন: স্কুল, দোকান, বিপণি বিতান, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, অফিস, বাস ও ট্রেন ইত্যাদি) এবং ৫৯.১% ছেলে ও ৪৯.৪% মেয়ে বিভিন্ন উন্মুক্ত পাবলিক প্লেসে (যেমন: খেলার মাঠ, ফুটপাথ, ভবনের প্রবেশ দ্বার, পার্ক, বিচ, বাস স্টেশন ও রেল স্টেশন) পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গার্ল গাইডস এর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনার ছবি, মার্চ ২০২২

তামাক সেবন, ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতি হতে দেশের জনগণকে রক্ষায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২০১৬ সালে সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটে **২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন।** তিনি এ ঘোষণায় সুনির্দিষ্ট যে তিনটি নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন অন্যতম। আমি মনে করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আমরা যদি বিদ্যমান আইন সংশোধন করে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারি তাহলে শিশু ও নারীদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

আইন সংশোধন একটি চলমান ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। তাই বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নেও আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সকল অফিসে আইন অনুযায়ী নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শন করতে হবে। নো-স্মোকিং সাইনেজ থাকলে মানুষ সচেতন হবে। পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান হতে বিরত থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু পার্ক, শিশুদের খেলাধুলার স্থান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আইন অনুযায়ী শতভাগ ধূমপানমুক্ত। এসব বিষয়ে প্রচারণা জোরদার করা হবে।

বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের চাইতে কম বয়সী কোন ব্যক্তির নিকট বিড়ি-সিগারেটসহ তামাক পণ্য বিক্রি বা তাদের দ্বারা বিক্রি নিষিদ্ধ। শিশুদের তামাক সেবন থেকে দূরে রাখতে শিশুদের নিকট তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নের বিষয়ে সকলের ভূমিকা রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শিক্ষক, অভিভাবক সবার ভূমিকা রয়েছে।

সবার সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা যদি শিশু, নারীসহ অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারি তাহলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে।

জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ জরুরি

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী
(একুশে পদকপ্রাপ্ত এবং শব্দ সৈনিক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র)
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র আওতাভূক্ত দেশসমূহ ১৯৮৭ সাল থেকে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করে আসছে। সর্বগ্রাসী তামাক নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশেও ১৯৮৮ সালে থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। মূলত, ৯০ এর দশক থেকে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টায় তামাকমুক্ত দিবস পালনসহ তামাক বিরোধী সামাজিক আন্দোলনটি বেগবান হয়।

বর্তমানে তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষয়-ক্ষতি রোধে 'এফসিটিসি' এর আলোকে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি প্রণীত হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচলন, তামাকজাত দ্রব্যে ১% হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদের উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন রয়েছে। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল সংস্থা ও ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করেছে। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত 'সাউথ এশিয়ান স্পীকার্স সামিটে' তিনি বলেন, "আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাই।" এ ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগেও বিভিন্নজন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু একাডেমিতে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনার, এপ্রিল ২০২২

Global Adult Tobacco Survey-2017 তে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পনেরোর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে ৩৫.৩% (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) মানুষ তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন। ২০০৯ সালে তামাকসেবী ছিলো ৪৩.৩%। সুতরাং তামাক সেবনের শতকরা হার নিম্নগামী হয়েছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরতদের আশান্বিত করে। পক্ষান্তরে, কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বিঘ্নতা সৃষ্টি করছে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ প্রতিবেশকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করছে।

এফডিসি-তে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, ছবিঃ মানস, এপ্রিল ২০২২

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো 'তামাক'। তামাক চাষাবাদ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবনসহ প্রতিটি ধাপেই পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, "Tobacco: Threat to our environment" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে, "তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ।" বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর যথার্থতা রয়েছে এবং প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। কারণ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় আলোচ্য বিষয়। জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বৈশ্বিকভাবে ঐক্যমত গড়ে তোলা হচ্ছে। ভূক্তভোগী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের কারণে ১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী (প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয়) আনুমানিক ১.৫ বিলিয়ন হেক্টর বন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যা ২০% বার্ষিক গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে! তামাক চাষে প্রচুর পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয় বিধায় বনাঞ্চল ধ্বংস করে চাষাবাদযোগ্য জমি তৈরি করা হয়। তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করতে চুল্লিতে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পোড়ানো হয়। গবেষণার তথ্যমতে, ৩০০টি সিগারেট তৈরি করতে প্রায় একটি সম্পূর্ণ গাছ প্রয়োজন হয়!

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রকাশিত 'তামাক ও এর পরিবেশগত প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ

তামাক চাষে প্রচুর সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হয় যা মাটি ও পানি দূষণ করে এবং মাছসহ জলাশয়ের উদ্ভিদচক্রের মারাত্মক ক্ষতি করে। উদাহরণ হিসেবে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর কথা বলা যায়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, নদীর উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়, মানিকছড়ি ও নদীর তীর সংলগ্ন পাহাড়ের ধারে দীর্ঘদিন ধরে তামাক চাষের কারণে তামাকের নির্যাস ও চাষে ব্যবহৃত সার এবং রাসায়নিক মিশ্রিত পানি সরাসরি গিয়ে নদীতে পড়ায় হালদার পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বর্ষার শুরুতেও পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে তামাকের মূল এবং পচা তামাক পাতা গিয়ে পড়ে নদীতে।

ঠিক প্রজনন মৌসুমেই বেশি দূষণ হয় বিধায় মৎস উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে। সুতরাং, তামাক চাষ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তামাক চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।

উল্লেখ্য যে, জেনেভায় অনুষ্ঠিত এফসিটিসি'র কনফারেন্স অব দ্য পার্টিসে (কপ-৮) বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো অবিলম্বে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ এ, তামাকের বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান, তামাক চাষের ক্ষতি থেকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ। সুতরাং উক্ত চুক্তি প্রতিপালনে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ১২ ধারায় তামাক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে, বিশেষত: তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে একটি নীতি প্রণয়নের কথা বলা আছে। যতদূর জানা যায়, একটি খসড়া নীতি প্রণীত হয়েছে। কিন্তু, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সেটি চূড়ান্ত হয়নি। সময়ের প্রয়োজনে নীতিটি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে তামাকজনিত কারণে বিভিন্ন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে (টোব্যাকো এটলাস ২০১৮)। অন্যদিকে, করোনা সংক্রমণে বাংলাদেশে প্রাণহানি ঘটেছে ২৯,১২৭ জনের (১৭ মে, ২০২২)। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনাসহ মৃত্যুর অন্যান্য কারণ'তো আছেই। সুতরাং, বিচারিক মানদন্ডে এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায়, করোনার চাইতে বড় মহামারি এখন 'তামাক'!

করোনা ভাইরাস মহামারীতে 'তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আবারো নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে। গবেষণায় জানা গেছে, ধূমপায়ী/তামাক সেবীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪গুণ বেশি। করোনা মহামারীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী উক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৬২ লাখের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। সংখ্যার হিসেবে এই মৃত্যুর পরিমাণ কম বলার সুযোগ নেই। তবে এর চাইতে ভয়ঙ্কর নিরব মহামারী 'তামাক' মানুষের জীবন ও প্রকৃতি-প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেই চলেছে। কারণ, বিশ্বে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়। এদের সিংহভাগই বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ। কারণ, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো এসব দেশকে ব্যবসার উর্বর ক্ষেত্র ও তাদের জনগণকেই বৃহত্তর ভোক্তা হিসেবে বেছে নেয়। ফলে এ সকল দেশে তামাকজনিত রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব, অপুষ্টি ও মৃত্যুহার, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে।

প্রাণঘাতি পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব বিস্তারের ঘটনা নতুন নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানির পরিচালনা পরিষদে সরকারের একাধিক প্রতিনিধি ও তামাক কোম্পানিতে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার থাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোকে বাধাগ্রস্থ বা বিলম্বিত করাসহ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা লক্ষ্যে করা যায়।

এজন্য তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার ও পরিচালনা পরিষদ থেকে সরকারের কর্মকর্তাদের সরিয়ে আনা প্রয়োজন।

এমনতিহৈ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এদিকে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি শীর্ষস্থানীয় তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর একটি 'বাংলাদেশ'। সুতরাং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এ লক্ষ্যে তামাক কোম্পানিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার সময় এসেছে। তামাকের কারণে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তা জনসম্মুখে প্রচার ও তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য সরকারের নীতিগত অবস্থান আরো সুদৃঢ় করতে হবে। এক্ষেত্রে এফসিটিসি'র আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আরো শক্তিশালীকরণ, তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহতকরণে 'গাইডলাইন', 'জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' প্রণয়ন এবং তামাক কোম্পানির সাথে সকল অংশিদারিত্ব বর্জন করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে এবং আগামী প্রজন্মকে তামাক ও মাদকের নেশা থেকে রক্ষা করতে এবং স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং তামাকের আগ্রাসন থেকে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার ও জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

লেখক: **বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী,** একুশে পদকপ্রাপ্ত এবং শব্দ সৈনিক (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস)।
সদস্য, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়) সাম্মানিক জেষ্ঠ উপদেষ্টা, ডিপার্টমেন্ট অব ডেন্টাল সার্জারী, বারডেম ও অধ্যাপক, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ
prof.arupratanchoudhury@yahoo.com

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ

জালালউদ্দিন আহমেদ

যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক, IMBRTF Project

বিশ্বব্যাপী রেলগাড়ী অর্থাৎ ট্রেন একটি নিরাপদ গণপরিবহন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাস বা সড়ক পথের অন্যান্য গণ পরিবহনের তুলনায় ট্রেন অনেক বেশি নিরাপদ ও পরিবেবান্ধব। বিশেষ করে, এটি শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী ও অসুস্থ্যদের জন্য আরামদায়ক পরিবহন। এছাড়া ট্রেনে বিভিন্ন স্তরের কামরা (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ), বিভিন্ন ধরন ও মূল্যমানের আসন থাকায় ধনী থেকে দরিদ্র সব শ্রেণীর যাত্রীদের পরিবহনের সুযোগ রয়েছে। সড়ক পরিবহনের চাইতে এটি অনেক সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গণপরিবহনও। এছাড়া বছরগুলোতে সড়ক পথে ক্রমবর্ধমান যানজট বাড়লেও ট্রেনের যাত্রীদের এরূপ সমস্যায় পড়তে হয় না। এসব কারণে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী ও অসুস্থদের দূরবর্তী যাতায়াতে রেল আস্থার পরিবহন। জনপ্রিয় হওয়ায় সবসময় যাত্রীদের যে চাহিদা থাকে সে চাহিদা অনুযায়ী টিকেট সরবরাহ করা যায় না। ঈদ ও বিভিন্ন উৎসবে যাত্রীদের যে চাপ তৈরি হয় সে চাপ সামাল দেয়ার সক্ষমতা এখনও পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বিশ্বব্যাপী ট্রেনের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ায় নতুন নতুন ট্রেন ও বগি সংযুক্ত করার মাধ্যমে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলপথ-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুতে রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এ রুটে রেলপথ নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সব দিক বিবেচনায় এটা বলা যায় যে, দেশব্যাপী নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলপথ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

ট্রেনের প্রধান উদ্দেশ্য যাত্রী পরিবহন। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করে থাকেন। যাত্রীদের একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াতের সুযোগ প্রদান বাংলাদেশ রেলওয়ে'র প্রধান দায়িত্ব। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন তামাকমুক্ত ট্রেন ও রেল স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে দেখা দেয়। কারণ, তামাক সব দিক থেকে পরিবেশকে দূষিত করে। তামাকের ব্যবহার ও ধূমপান অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য দায়ী।

কালের পরিক্রমায় মানুষ তামাক, ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছে এবং এসব ক্ষতিকর নেশা নিয়ন্ত্রণে ক্রমশঃ আইনী বিধিনিষেধ বিস্তৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২৫০টি উপাদান মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ৭০টি রাসায়নিক উপাদান শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ধূমপান করার সময় ধূমপায়ী নিজের যেমন ক্ষতি করেন তেমনি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন বা বাসায় ধূমপানের কারণে ধোঁয়ার অধিকাংশ বাইরে চলে আসে। ধূমপায়ীর আশেপাশে যদি অধূমপায়ী থাকে তাহলে তারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পরোক্ষ ধূমপানও বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ হয়ে থাকে। নারী, শিশুসহ ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রী অধূমপায়ী। এজন্য ট্রেনের যাত্রী ও স্টেশনে আগতদের তামাকের ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা নাগরিক হিসাবে আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

রেলওয়ে আইন ১৮৯০ ও রেলওয়ের নিজস্ব বিধিবিধানে ট্রেন ও রেলস্টেশনে ধূমপান নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। রেলের নিজস্ব প্রবিধানে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রেল স্টেশনে তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং অধূমপায়ী যাত্রীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা প্রদান করা রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনগত দায়িত্বও বটে।

২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' এর সংশোধন এবং এর আলোকে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫' জারি করা হয়। এ আইন বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা মূখ্য হলেও রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এ আইন-এর ধারা ২(চ)-এ পাবলিক প্লেস-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী রেলওয়ের সকল অফিস, রেল স্টেশন, রেল ওয়ার্কশপ (কারখানা), স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামাগার (ওয়েটিং রুমে), ট্রেনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি (যেমন: প্ল্যাটফর্ম) ইত্যাদি পাবলিক প্লেস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া আইনের ধারা ২(ছ)-এ পাবলিক পরিবহনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী রেলগাড়ী (ট্রেন) পাবলিক পরিবহন।

আইনের ধারা-৪ অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এজন্য ৩০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এ আইনের ধারা-৮ অনুযায়ী ট্রেন ও রেল স্টেশনে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫' অনুযায়ী এ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং রেলওয়ের সকল অফিস, ট্রেন ও রেল স্টেশনে এ আইন বাস্তবায়ন রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ধোঁয়াবিহীন তামাকও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। বিশেষ করে, বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে চুন, জর্দা বা সাদাপাতা/তামাক পাতাসহ পান খাওয়ার নেশা লক্ষ্য করা যায়। যারা এভাবে পান-তামাক খায় তারা পানের পিক যত্রতত্র ফেলে থাকেন। ট্রেন ও স্টেশনের পরিবেশ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে পানের পিক অনেকাংশে দায়ী। পানের পিকের মাধ্যমে যক্ষা, কোভিড-১৯ এর জীবানুসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। পরিবেশ মারাত্মকভাবে নোংরা ও দূষিত হয়। এজন্য ট্রেন ও স্টেশনগুলোকে সম্পূর্ণভাবে তামাকমুক্ত করা জরুরি।

সর্বোপরি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিট ২০১৬ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এ ঘোষণায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন করা সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন রাজধানীর রেলপথ ভবনে "ইনিশিয়েটিভ টু মেকবাংলাদেশ রেলওয়ে টোব্যাকো ফ্রি" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির করেন (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২)-পিআইডি

এ প্রেক্ষাপটে রেলপথ মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নসহ রেলওয়ের নিজস্ব আইন অনুযায়ী ট্রেন, রেল স্টেশন ও রেলের অফিসসমূহ তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বুমবার্গ ফিলানথ্রপিস এর আওতায় দি ইউনিয়ন এর সহায়তায় Initiative to make Bangladesh Railways Tobacco Free (IMBRTF) শীর্ষক দু'বছর মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১-নভেম্বর ২০২৩) কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হল:

- শিশু, নারী, অসুস্থ্য ব্যক্তি, গর্ভবতী নারীসহ অধূমপায়ী যাত্রীদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে সুরক্ষা প্রদান;
- রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে ধূমপান বিরোধী আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ;
- তামাক ও ধূমপানমুক্ত রেলওয়ে গড়ে তোলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনসহ সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে আইন ও অন্যান্য প্রশাসনিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
- ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ মডিউলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অন্তর্ভুক্তি।

ইতোমধ্যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনসহ রেলওয়ে আইন-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান বাস্তবায়নে ১০টি মডেল স্টেশন নির্বাচন করা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্বলিত বিলবোর্ড ও নো-স্মোকিং সাইনেজসহ উপকরণ, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি সহ প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রচারণা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

সবাই যার যার অবস্থান থেকে যদি সক্রিয় থাকে তাহলে ট্রেন ও স্টেশন তামাকমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে শিশু, নারী, অসুস্থ, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারীসহ অধূমপায়ী যাত্রীগণ উপকৃত হবে। স্টেশন ও ট্রেনে যাত্রীদেরকে পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ট্রেন ও স্টেশনে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার যেমন: পানের সঙ্গে চুন-জর্দা বা সাদাপাতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হবে।
আমরা সকলে নিঃসন্দেহে একটি মহতী উদ্দেশ্যে একাত্ম হয়েছি।

পরিবেশ রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তায় তামাক চাষ বন্ধ করা প্রয়োজন

আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) ও
এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন।

তামাক ও তামাক থেকে উৎপাদিত সকল পণ্যের ব্যবহার বা সেবন সরাসরি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এ বিষয়টি সকলে জানেন। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত তামাক পণ্যের মধ্যে ধূমপানের ক্ষেত্রে বিড়ি ও সিগারেট অন্যতম। শহুরে তরুণদের মধ্যে ই-সিগারটের প্রচলন শুরু হয়েছে। ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের মধ্যে পানের সঙ্গে জর্দা ও শুকনো তামাক পাতা (সাদাপাতা / আলাপাতা নামেও পরিচিত) বহুল প্রচলন এবং মাড়িতে গুলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ সকল তামাক পণ্যই প্রাণঘাতী।

পরিবেশের ওপর তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। তামাককে পরিবেশের অন্যতম প্রধান শত্রু বললে অত্যুক্তি হয় না। তামাক চাষ, তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও তামাক সেবন-সব ক্ষেত্রেই তামাক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। বলা যায়, তামাকের কারণে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল উপাদানই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যেমন: পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে বায়ু, পানি, মাটি, বনজ সম্পদ, জীববৈচিত্র এবং জলবায়ু। এখানে উল্লেখিত সবগুলো উপাদানই তামাকের বিষে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিভাবে, সেটা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

তামাক চাষ দিয়েই শুরু করি। জমিতে চাষ করা হয়, এরকম যত ফসল আছে তার মধ্যে তামাক খুবই ক্ষতিকর। তামাক চাষের কারণে মাটি, পানি, বায়ুসহ পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তামাকের বিষাক্ত রাসায়নিক ও তামাক চাষে ব্যবহৃত কীটনাশক মাটিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। ফলে কেঁচোসহ উপকারী পোকামাকড় মারা যায়। তামাক চাষে অনেক বেশি পানি প্রয়োজন হয়। এজন্য সাধারণত ঢালু জমি, নদী ও খালপাড়ের কৃষি জমিতে তামাক চাষ করতে হয়। যেমন: পার্বত্য এলাকায় সাঙ্গু, মাতামুহুরীসহ বিভিন্ন নদীর পাড়ে তামাক চাষ বেশি হয়। ফলে খুব সহজেই তামাকের বিষাক্ত বর্জ্য ও কীটনাশক মিশ্রিত পানি নদী-নালা-খাল-বিলকে দূষিত করছে। ফলে মাছসহ পানিনির্ভর জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, তামাক চাষের কারণে পার্বত্য এলাকার নদীগুলোতে স্থানীয় মাছের বংশবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে বেশ কয়েক বছর আগে চ্যানেল আইয়ের বার্তা পরিচালক ও কৃষি বিষয়ে স্বনামধন্য সাংবাদিক জনাব শাইখ সিরাজ ধারাবাহিক প্রতিবেদন করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তামাক বিষক্রিয়ায় চলনবিলের মাছের আধারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ক্রমাগত কয়েক বছর জমিতে তামাক চাষ করার কারণে কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। মূলত, এ কারণে তামাক কোম্পানিগুলো নতুন নতুন এলাকায় তামাক চাষ বিস্তৃত করছে। খাদ্য উৎপাদনযোগ্য কৃষি জমিতে তামাক চাষ করায় খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তাছাড়া তামাক চাষ শুধু সে জমিরই ক্ষতি করে না, আশে পাশে অন্যান্য ফসলী জমিরও ক্ষতি করে থাকে। তামাক পাতার কারণে এমন সব পোকার আগমন ঘটে যা আশেপাশের ফসলী জমির ফসলকে আক্রমণ করে।

একটি মৌসুমে জমিতে তামাক চাষের কারণে অন্য কোন ফসল ফলানো যায় না। কারণ জমি তৈরি, বীজ বপন, পরিচর্যা, তামাক গাছ হতে কাঁচা পাতা সংগ্রহ ও সর্বশেষ তামাক গাছের গোড়া তোলা ইত্যাদি কারণে তামাক চাষের সময়কাল আগষ্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস। ফলে তামাকের কারণে ৩টি মৌসুমী ফসলের ক্ষতি হয়। উবিনীগ এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, শুধু বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় ৫৩৯৯ একর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে। এসব জমিতে ২১ ধরনের খাদ্যশস্য চাষ করা যেত এবং তার মূল্য দাড়াত ১১ কোটি টাকা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তামাক চাষ জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতির কোন ক্ষতি করলেও খাদ্যশস্য চাষে এসব ক্ষতি হয় না।

তামাক চাষের একটা পর্যায়ে পরিণত তামাক গাছ হতে কাঁচা তামাক পাতা সংগ্রহ করা হয়। এসব তামাক পাতা রোদে শুকাতে কয়েকদিন সময় প্রয়োজন হয়। রংপুর অঞ্চলে বার্লি নামীয় জাতের তামাক পাতা এভাবে শুকানো হলেও দেশের অধিকাংশ তামাক পাতা চুল্লীতে আগুনের তাপে শুকানো হয়। কাঁচা তামাক পাতা চুল্লীতে শুকানো তথা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ক্রমাগত বৃক্ষ নিধনের কারণে দেশের বনজ সম্পদ ধবংশ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি কেজি তামাক পাতা চুল্লির মধ্যে আগুনের তাপে শুকাতে ২৫কেজি কাঠ পোড়াতে হয়। এতে ধ্বংস হচ্ছে বনজ সম্পদ, ফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে পরিবেশ। বিশেষ করে, পার্বত্য এলাকার গাছ কেটে তামাকের চুল্লীতে ব্যবহার করায় এখানে বনজ সম্পদ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর যত পরিমাণ বৃক্ষ নিধন হয়, তার ৩০ ভাগ ব্যবহার শুধু তামাক পাতা শুকানোর কাজে। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধন হচ্ছে।

তামাক কোম্পানিগুলো নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে বৃক্ষরোপন অভিযানের নামে দ্রুত বর্ধনশীল ইপিল ইপিল, ইউক্যালিপটাসসহ এমন সব গাছ লাগাচ্ছে, যা পার্বত্য এলাকার পরিবেশের জন্য উপযোগী নয়। বিদেশী গাছ আমাদের জীববৈচিত্রের জন্য হুমকি। তামাক কোম্পানির আগ্রাসী সামাজিক বনায়নের কারণে পার্বত্য এলাকায় বিদেশী গাছের সংখ্যা বেড়ে

গেছে। এছাড়া তামাক পাতা যখন চুল্লীতে আগুনের সাহায্যে তাপ দিয়ে শুকানো হয়, তখন ঐ এলাকার বায়ুদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করে। যা ফুসফুসের প্রাণঘাতী দীর্ঘমেয়াদী রোগ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগব্যাধি বৃদ্ধি করে।

পার্বত্য এলাকার মানুষ প্রাকৃতিক পানি নির্ভর। অথচ সাঙ্গু, মাতামুহুরীসহ পার্বত্য জেলা বান্দরবান এর নদী ও জলাশয়ের ঢালু উর্বর জমিতে ক্ষতিকর তামাক চাষ করায় এ জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ও তামাকের রাসায়নিক গিয়ে নদী-জলাশয়ের পানিতে মেশায় সে পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে মৎস্য সম্পদসহ জলজ প্রাণীর জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। পাশাপাশি এ পানি ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। বিশেষ করে মাছের ডিম পাড়ার সময়ে তামাকের কীটনাশক পানির সঙ্গে মেশার ফলে মাছের বংশ বিস্তার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ক্রমশ এ এলাকায় মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

শস্যের ভান্ডার খ্যাত উর্বর চলনবিল এলাকা (পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ) ছাড়াও মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, দিনাজপুর জেলায়ও তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় দরিদ্র কৃষকদের তামাক চাষে ধাবিত করা হচ্ছে। তামাক চাষের কারণে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, জলজ প্রাণী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্যশষ্য উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই নতুন নতুন এলাকায় তামাক চাষ এখনই বন্ধ করা দরকার। বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনযোগ্য কৃষি জমিতে তামাক চাষ বন্ধ করার বিষয়টি সরকার বিবেচনায় নিতে পারে।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও রংপুর এলাকায় তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তামাক চাষের এলাকাগুলোতে শিশু-কিশোরদের মধ্যে স্কুলে উপস্থিতির হার কমে যায়। মূলত, তামাক চাষ অধিক শ্রমনির্ভর হওয়ায় পরিবারের নারী-শিশু সকলকে সম্পৃক্ত করতে হয়। ফলে নারী ও শিশু স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার শিশুরা স্কুলে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিড়ি কোম্পানিতে কর্মরত শিশু
ছবি: দি এশিয়ান এজ, ১৩ জুন ২০১৭

ক্ষতিকর তামাক চাষে স্কুল পোশাকে কর্মরত শিশু
ছবির সূত্র: বাংলাদেশে তামাক চাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল, প্রজ্ঞা

তাছাড়া বিড়ি কোম্পানিগুলো শিশুদের শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগায়। এতে শিশুরা বিড়ি কারখানার বদ্ধ পরিবেশে নিকোটিনের সংস্পর্শে অসুস্থ্য হয়ে পড়ছে। এছাড়া দরিদ্র এসব শিশুর অধিকাংশই লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তদুপরি, বিড়ি কারখানাগুলো থেকে আশপাশের বাতাসে নিকোটিন ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে জর্দা ও গুল ফ্যাক্টরিও পরিবেশের ক্ষতি করছে। সিগারেটের কারখানা হতেও নিকোটিন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

সবশেষে তামাক সেবন করা হয়। প্রাণঘাতী এ নেশাদ্রব্য তিলে তিলে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। কিন্তু পরিবেশের উপরও তামাক সেবনের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেমন: বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭০০০ এর অধিক ক্ষতিকর রাসায়নিক রয়েছে। যখন একজন ধূমপায়ী পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন বা বাসা-বাড়িতে ধূমপান করেন তখন এসব রাসায়নিক বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অধূমপায়ীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এসব ক্ষতিকর রাসায়নিক গ্রহণ করে। এতে অধূমপায়ীদেরও ক্যান্সার, হৃদরোগ, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন ধরণের প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুঝুঁকি দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হিসাবে ধূমপানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া ধূমপান করলে বিড়ি-সিগারেটের উচ্ছিষ্টাংশ বা বাট যত্রতত্র ফেলা হয়। এসব বাট মাইক্রোপ্লাস্টিকের তৈরি। এগুলো পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো সহজে মাটির সঙ্গে মেশে না, ড্রেন-নালার মাধ্যমে জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এতে জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তামাক পণ্যের প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এতে প্লাস্টিক/পলিথিনের আবরণ থাকে যা পরিবেশের ক্ষতি করে। বিড়ি-সিগারেটের মোড়কে পলিথিনের আবরণ থাকে। জর্দা-গুলের কৌটা প্লাস্টিক উপাদানে তৈরি এবং এসবেও পলিথিনের আবরণ থাকে। এসব পলিথিন ও প্লাস্টিক পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

তামাক পরিবেশের শত্রু। পরিবেশ ছাড়াও জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সার্বিক উন্নয়নে এর প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। পরিবেশের ক্ষতি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য তামাক চাষ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক
প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি

নিত্য দিন ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে আমার মনে হয়- বাংলাদেশে এ সেবা আরও অনেক সহজ হওয়া উচিত, সহজলভ্য হওয়া উচিত। বস্তুত বিগত এক দশকে আমরা বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখেছি, প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে অতি-দারিদ্র্য। স্বাস্থ্য সুবিধার নাটকীয় পরিবর্তন কমিয়ে এনেছে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে-ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অনুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না কেন?
বলা বাহুল্য, বিষয়টি জটিল। তবে, তামাক খাতের অশুভ প্রভাব না থাকলে অন্যান্য উন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও কাজটি অনেক সহজ হতো। তামাক কোম্পানিগুলো প্রচার করে যে, "তামাক করের উচ্চহার চোরাচালানকে উৎসাহিত করে"। এছাড়া স্তরভিত্তিক "কর কাঠামো" বিদ্যমান থাকায় কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ। বর্তমানে দেশে ১৫ লাখের অধিক প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ তামাক সেবনের কারণে এবং ৬১ হাজারের অধিক শিশু পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও ক্যান্সার রিসার্চ-ইউকে এর সহযোগিতায় ২০১৮ সালে স্বাস্থ্য ব্যয় বিষয়ক এক গবেষণায় এ তথ্যসমূহ উঠে এসেছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে (মূল্যস্ফীতি-সমন্বিত) অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে দ্বিগুণের অধিক হয়েছে।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে এখনও জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য-ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সচেতনতার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তার উপরে উচ্চ মাত্রার তামাক সেবনের প্রবণতা জনসাধারণকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি ও ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তামাক ব্যবহারের ফলে হৃদরোগ, শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা ও ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে, যা প্রকারান্তরে স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ভার বৃদ্ধি, অকালমৃত্যু, জনজীবনে সুস্থ-সময় এর মেয়াদ হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বিনাশের মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গবেষণা কাঠামো ও তথ্যসূত্র: এ গবেষণায় অসুস্থতাজনিত-ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমপানের কারণে উদ্ভূত বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতির নিম্নোক্ত দুটি উপাদান পরিমাপ করা হয়েছে:
১. প্রত্যক্ষ ব্যয়: তামাকজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি এবং বহির্বিভাগে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যক্তিগত খরচ এবং সার্বিক জনস্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ব্যয়;
২. পরোক্ষ ব্যয়: তামাকজনিত রোগে সৃষ্ট অক্ষমতা ও অকাল মৃত্যুর কারণে উৎপাদনশীলতা এবং আয়ের ক্ষতি, অসুস্থতা পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপের মাধ্যমে জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১৮ সময়ে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপকালে বহু স্তরভিত্তিক গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ৬৪ জেলা হতে জনসংখ্যার আনুপাতিক সম্ভাবনার ভিত্তিতে মোট ১০ হাজার পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়। তন্মধ্যে জরিপে সংগৃহীত নমুনার গুরুত্বের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে তামাকজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ণয় করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, জরিপকৃত পরিবারসমূহের মধ্যে ২ হাজার ৬০০ পরিবারের প্রতিটিতে অন্তত একজন সদস্য তামাকজনিত গুরুতর ৭টি রোগের একটিতে আক্রান্ত; তাদের মধ্যে ৯৮৮ জন চিকিৎসা গ্রহণ করেছে বা করছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই ৯৮৮ জনের কাছ থেকে তাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যয় এবং নিজস্ব ও শুশ্রুষাকারীর কর্মসংস্থানের অবস্থান ও আয় সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি পরিমাপের ক্ষেত্রে কেবল ত্রিশ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের তথ্য বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

পরোক্ষ ধূমপানের প্রকোপ ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য হাঁপানি, অটিজম, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, নবজাতকের ওজন, শিশুর আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়। এছাড়া, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারের ব্যয়, সুনির্দিষ্ট কারণভিত্তিক মৃত্যু, তামাক খাতে রাজস্ব আয় বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সরকারি সূত্রসমূহ হতে নেয়া হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল: ত্রিশ ও তদূর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে তামাকজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব: হৃদরোগ, স্ট্রোক, শ্বাসযন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যান্সার, স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার

সর্বমোট (বর্তমান ও পূর্বের)	৯.১%
তামাক ব্যবহারকারী	১১.৪%
তামাক অ-ব্যবহারকারী	৭.২%

তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে তামাকজনিত প্রধান ৭টি রোগের একটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তামাক অ-ব্যবহারকারীদের তুলনায় ৫৭ শতাংশ বেশি এবং তামাকজনিত ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ১০৯ শতাংশ বেশি।

ত্রিশ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৭০ লাখের বেশি লোক তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এদের মধ্যে ১৫ লক্ষ লোকের (২২ শতাংশ) রোগাক্রান্ত হওয়ার সাথে তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ সংশ্লেষ রয়েছে। এছাড়া, ১৫ বছরের কম বয়সী ৪ লাখ ৩৫ হাজারেরও বেশি শিশু তামাকজনিত নানান রোগে ভুগছে, যাদের মধ্যে আবার ৬১ হাজারের অধিক (১৪ শতাংশ) শিশু বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। তামাক ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রতিবছর ১ লাখ ২৫ হাজার ৭১৮ জন মৃত্যুবরণ করে, যা জাতীয় পর্যায়ে সকল মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ।

তামাক ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমপানজনিত কারণে স্বাস্থ্য ব্যয়			**কোটি টাকায়**	
ক.	তামাক ব্যবহার			২৬৪৪০
ক.১	প্রত্যক্ষ ব্যয়	৮২০০		
ক.১.১	স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যক্তিগত ব্যয়		৬২০০	
ক.১.২	স্বাস্থ্য সেবা খাতে সরকারি ব্যয়		২০০০	
ক.২	পরোক্ষ ব্যয়	১৮২৪০		
ক.২.১	অসুস্থতার কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি		১৩২৯০	
ক.২.২	অকাল মৃত্যুর কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি		৪৯৪০	
খ.	পরোক্ষ ধূমপান			৪১৩০
খ.১	প্রত্যক্ষ ব্যয়	২০০		
খ.১.১	স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যক্তিগত ব্যয়		১৫০	
খ.১.২	স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারি ব্যয়		৪০	
খ.২	পরোক্ষ ব্যয়	৩৯৩০		
খ.২.১	অক্ষমতা/ অসুস্থতার কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি		০.০	
খ.২.২	অকাল মৃত্যুর কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি		৩৯৩০	
ক+খ	**তামাক ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমপানজনিত রোগের কারণে সর্বমোট ব্যয়**			**"৩০৫৭০" কোটি টাকা**

তামাক শিল্প বরাবরই দাবী করে আসছে যে, তামাক উৎপাদন ও বিক্রয় প্রক্রিয়া রাজস্ব আয় ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাস্তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব মতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাত হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা, এ সময়ে তামাকজনিত বিপুল স্বাস্থ্যব্যয় (৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা), যার ফলে রাজস্ব অবদানের গুরুত্বকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে।

অর্থনীতিতে তামাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তামাক পণ্যের ওপর তামাক ব্যবহারকারীর ব্যয় প্রকারান্তরে সরকারের রাজস্ব আয়, তামাক শিল্পের মুনাফা, তামাকচাষী ও কারখানা শ্রমিকের আয়ের উৎস। জাতীয় আয় গণনায় এ ব্যয় অন্তর্ভূক্ত হলেও আদতে এটি তামাক ব্যবহারকারী পরিবারের মূল্যবান সম্পদের অপচয়, যা অন্যান্য উত্তম বিকল্প তথা স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। সার্বিকভাবে, এ পরিবারসমূহ একদিকে তামাক পণ্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করে, অন্যদিকে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় এবং অকালমৃত্যু ও অক্ষমতাজনিত আয় হারানোর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হয়।

এ গবেষণায় তামাক চাষের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি, তামাক চাষে দূর্লভ কৃষি জমি ব্যবহারের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি, অগ্নিকান্ডের আশংকা ও ক্ষতি, যত্রতত্র সিগারেটের পরিত্যক্ত অংশ নিক্ষেপজনিত পরিবেশ দূষণ এবং অন্যান্য ক্ষতি পরিমাপ করা হয়নি, যা ভবিষ্যত গবেষণার আওতায় আসতে পারে। তবে, এটি সত্যি যে, তামাক ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পরিবারসমূহের প্রকৃত ভোগান্তি পরিমাপ করা কখনই সম্ভব নয়।

দরিদ্রদের ক্ষেত্রে তামাক ক্রয়ের খরচ ও তামাক ব্যবহারজনিত ক্ষতির ভয়াবহতা অত্যধিক। তামাকের খরচ ও স্বাস্থ্যঝুঁকিজনিত ব্যয় মেটাতে গিয়ে তারা তাদের অতিআবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো মেটাতে ব্যর্থ হয়, যা কালক্রমে স্বল্প আয়ের পরিবারসমূহের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। তামাকের ব্যবহার এভাবেই দারিদ্রের দুষ্টচক্র এবং অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত বৈষম্যকে তীব্রতর করে তোলে।

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের ওপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলে তার প্রতিকার করা অত্যন্ত জরুরি। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সে প্রয়োজনকেই প্রতিফলিত করে। তবে, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ দুরূহ; কেবল দ্রুত ও কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। এজন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন:

- তামাকের ওপর আরোপিত করের হার এবং তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি;
- তামাক ব্যবহার ও প্রতিরোধ নীতিমালা নিয়মিত পরিবীক্ষণ;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জনগণকে তামাকের ধোঁয়া থেকে সুরক্ষা দেয়া;
- তামাক ব্যবহারকারীদের ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- তামাক পণ্যের মোড়কে সতর্কীকরণ লেবেল ৯০% এ উন্নীত করার মাধ্যমে তামাক ব্যবহারের মৃত্যুঝুঁকি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা;
- তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত আইনী বিধানের বাস্তবায়ন;
- শিল্পখাতে করারোপ করার মাধ্যমে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করা; এবং
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিকট তামাক পণ্য বিক্রয়ের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা জোরালোভাবে কার্যকর করা।

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে ৩৫.৩ শতাংশ ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে, যাদের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ। এ প্রেক্ষাপটে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রচেষ্টা এখন থেকে শুরু করা হলেও প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৮ লক্ষ তামাক ব্যবহারকারীকে তামাক ব্যবহার থেকে সরিয়ে আনতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনসমূহ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর কাঠামো সহজীকরণ এবং তামাক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে একটি সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেছে। এ প্রস্তাবে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাব্যতার পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে।

যুব সমাজের মধ্যে তামাক ব্যবহার শুরু করার প্রবণতা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা না গেলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তামাক ব্যবহারকারী যোগ হতে থাকবে। যুব সমাজকে তামাক ব্যবহার শুরু করা হতে বিরত রাখার ক্ষেত্রে করের হার ও মূল্য বৃদ্ধি যে বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখে তা বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত। পাশাপাশি, মূল্য বৃদ্ধির প্রতি অধিক সংবেদনশীলতার ফলে করের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে তামাক ব্যবহার প্রবণতা দ্রুত কমানো সম্ভব হয়। জাতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় করনীতিকে কর বর্হিভূত নীতি-কৌশলের সাথে সমন্বিত করা হলে করের হার ও মূল্যবৃদ্ধি তামাক ব্যবহার কমাতে অধিকতর ফলপ্রসু হতে পারে।

গবেষণার পূর্ণাঙ্গ দল:

ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রধান, রেডিওথেরাপি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এবং প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি
সৈয়দ নাইমুল ওয়াদুদ, পিএইচডি, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মারুফ আহমেদ, সহযোগী গবেষক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
রেহানা পারভীন, যুগ্ম সচিব, এসইআইপি প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইফতেখারুল হক, পিএইচডি, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক, এপিডেমিওলোজি অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিবৃত্তকরণ সেবা প্রদান জরুরি

অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশে জনগণ সিগারেট-বিড়ি ধূমপানের পাশাপাশি জর্দা, গুল, সাদা পাতার মতো ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যও ব্যবহার করে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭ অনুসারে, বাংলাদেশে প্রায় ৩৫.৩% (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) প্রাপ্তবয়স্ক (১৫ বছর বা তার বেশি) কোনো না কোনো প্রকার তামাক ব্যবহার করে। তামাক ব্যবহারের প্রবণতা শহরাঞ্চলের তুলনায় (২৯.৯%) গ্রামাঞ্চলে বেশি (৩৭.১%)।

তামাক ব্যবহারের এই উচ্চ হার জনস্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ২০১৮ সালে তামাকের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষ মারা গেছে, যা দেশের মোট মৃত্যুর ১৩.৫%। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত। এছাড়া ৬১ হাজারের বেশি শিশু পরোক্ষ ধূমপানজনিত রোগে ভুগছে। অন্যদিকে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হচ্ছে।

এই স্বাস্থ্য ও আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলায় তামাকের ব্যবহার কমানোর বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরেই দেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলো নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বে প্রথম এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে। দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস ও পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়েছে, যা বর্তমানে পুনঃসংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

তামাকের ব্যবহার কমাতে দুই ধরনের লক্ষ্য নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। একটি লক্ষ্য হবে নতুন ব্যবহারকারী তৈরির পথ রুদ্ধ করা এবং অন্যটি হলো বর্তমান ব্যবহারকারীদের তামাক ছাড়তে সহায়তা দেওয়া। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৭০ শতাংশ ধূমপায়ীকে বছর অন্তত একবার চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। আর তামাক ছাড়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। চিকিৎসকের পরামর্শ শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ২-৪ শতাংশ ধূমপায়ী তামাক ছেড়ে দেয় এমন প্রমাণও রয়েছে। ধূমপান ছাড়ার কয়েক মাসের মধ্যেই এর সুফল পাওয়া যায়। ১-৩ মাস পরেই দেখা যায় শরীরে রক্ত চলাচল অনেক ভালোভাবে হচ্ছে। আর আগের তুলনায় ফুসফুস শতকরা ৩০ ভাগ বেশি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। তামাক ছাড়ার এক বছর পর হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। শুধু তাই নয়, ১৫ বছর ধূমপান থেকে বিরত থাকলে হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ীদের মতো একেবারে কমে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে তামাক নিবৃত্তকরণ সেবা বিস্তৃত পরিসরে গড়ে ওঠেনি। গ্যাটস ২০১৭-তে দেখা গেছে, বর্তমান ধূমপায়ীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬.২%) এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীদের অর্ধেক (৫১.৩%) তামাক ছাড়তে চান। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগীদের জন্য কোনো কার্যকর তামাক নিবৃত্তকরণ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ২০১০ সাল থেকে রোগীদের জন্য তামাক নিবৃত্তকরণ ক্লিনিক পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে মূলত নার্সদের তামাক নিবৃত্তকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা রোগীদের তামাক ছাড়তে নানারকম পরামর্শ দিয়ে থাকে। যদিও তামাক আসক্তির চিকিৎসায় কাউন্সেলিং ও ওষুধ সেবন কার্যকর ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক আসক্তি নির্মূলের ওষুধ পাওয়া যায় না। এই ধরনের ওষুধ উৎপাদন ও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেইসাথে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাক নিবৃত্তকরণ ক্লিনিক স্থাপন করাও জরুরি। প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে এই সেবা চালু করা হলেও বিপুলসংখ্যক তামাক ব্যবহারকারী সেবা নিতে পারবে।

তামাক নিবৃত্তকরণ ক্লিনিক স্থাপনের পাশাপাশি টেলিফোননির্ভর পরামর্শ সেবা বা জাতীয় কুইটলাইন সেবাও চালু করা যেতে পারে। এটি এমন একটি টেলিফোন সেবা যেখান ফোন করে তামাক ব্যবহারকারীরা তামাক ছাড়ার বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারবেন। এ জাতীয় সেবাসমূহ চালু করা গেলে আমরা তামাক ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারবো যা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে।

পরিবেশ রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরুরী

ইকবাল মাসুদ
পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

তামাক শুধু মানুষের স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করে না, এটি পরিবেশকেও বিপন্ন করে। ই-সিগারেট ও সিগারেটের বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় না। এসব বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নিকোটিনসহ বিষাক্ত রাসায়নিক ও ভারী ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি। যেগুলো পানি, বাতাস ও মাটি/জমিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। আনুমানিক ৭৬৬,৫৭১ মেট্রিক টন সিগারেটের ফিল্টার/বাট প্রতিবছর পরিবেশ-প্রতিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। উপরোক্ত, ২০১৮ সালে, আমেরিকানরা ই-সিগারেট বর্জ্য সহ ২.৭ মিলিয়ন টন ইলেকট্রনিক বর্জ্য তৈরি করেছে, যা শেষ পর্যন্ত ল্যান্ডফিল বা ইনসিনারেটরে পরিণত হয়। সিগারেট ও ই-সিগারেটের বর্জ্য মাটি, সমুদ্র সৈকত এবং পানিকে দূষিত করতে পারে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, সিগারেট ও ই-সিগারেটের বর্জ্য বন্যপ্রাণীর জন্যও ক্ষতিকর।

সিগারেটের ফিল্টার প্রায়শই পরিবেশে, রাস্তা, ফুটপাতে ও অন্যান্য জনসাধারণের চলাচলের জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। তারপর সেগুলো বৃষ্টির পানিতে ড্রেনে প্রবাহিত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত নদী, সৈকত এবং মহাসাগরকে দূষিত করে। যেহেতু সিগারেটের ফিল্টার প্রাথমিকভাবে প্লাস্টিকের তৈরি যেগুলি বায়োডিগ্রেড হয় না, এগুলো উপকূলে বা পানির নীচে জমা হয়।

ই-সিগারেটের বর্জ্য সাধারণ সিগারেটের ফিল্টারের তুলনায় আরও গুরুতর পরিবেশগত হুমকি তৈরি করে। কারণ এতে ধাতু, একক ব্যবহারের প্লাস্টিকের কার্তুজ, ব্যাটারি এবং ই-তরলগুলিতে বিষাক্ত রাসায়নিক রয়েছে। ই-সিগারেট প্রস্তুতকারীরা ভোক্তাদের কীভাবে ব্যবহৃত ডিভাইস বা কার্তুজ সংরক্ষণ বা ধ্বংস করতে হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে না এবং সেখানে কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বলা নেই।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় অর্ধেক (৪৬.৯%) ই-সিগারেট ভোক্তা বলেছেন যে তারা বর্তমানে যে ই-সিগারেট/ভ্যাপ ডিভাইসটি ব্যবহার করেন তা ব্যবহার পরবর্তী ধ্বংস করা সংক্রান্ত তথ্যপ্রদান করে না। যেমন ব্যবহৃত ব্যাটারি বা খালি পড কোথায় ফেলবে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে যারা গত ৩০ দিনে ভ্যাপ করেছেন তাদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৭.৮%) ই-সিগারেটের বর্জ্য ব্যবহারের পর ধ্বংস বা ডিসপোস করা অসুবিধাজনক বলে মনে করেছেন।

সিগারেটের ফিল্টারগুলি সেলুলোজ অ্যাসিটেট থেকে তৈরি করা হয়, এসব প্লাস্টিক জৈবিক পরিস্থিতিতে সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ফিল্টারগুলি যত্রতত্র, নালা-নর্দমায় দীর্ঘদিন থেকে যায়। রাস্তা ও সৈকতে ফেলে দেওয়া সিগারেটের ফিল্টার বায়োডিগ্রেড হয় না। ভালোভাবে একটি সিগারেটের ফিল্টার ক্ষয় হতে কমপক্ষে নয় মাস থেকে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। সূর্যের আলো সিগারেটের ফিল্টার ভেঙ্গে ফেলতে পারে, কিন্তু এর ছোট টুকরোগুলো পানি বা মাটিতে দীর্ঘদিন থেকে যায়।

পরিবেশের উপর তামাক বর্জ্যের প্রভাবের উপর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, সেইসাথে পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট খরচ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন বা পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক দেশ ইতোমধ্যে সমুদ্র সৈকতে ও পার্কে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে।

প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গেছে যে তামাকজাত দ্রব্যের জৈব যৌগগুলো (যেমন নিকোটিন, সিগারেটের অবশিষ্টাংশ এবং ধাতু) ও সিগারেটের ফিল্টার প্রতিবেশ-পরিবেশ ও জলাশয়ে যায়। এগুলো জলাশয়ের মাছ ও অণুজীবের জন্য তীব্রভাবে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

একটি সিগারেটের ফিল্টার থেকে যে রাসায়নিক বের হয় (এক লিটার পানি ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা) তা ৫০ শতাংশ নোনা পানির এবং ৯৬ ঘন্টার জন্য এটির সংস্পর্শে থাকা স্বাদু পানির মাছকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়। সিগারেটের ফিল্টার পানিতে ভারী ধাতু দূষণের উৎস হতে পারে, যা স্থানীয় জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি করতে পারে।

ব্যাটারি ও ই-সিগারেট উভয় ডিভাইসেই সীসা ও পারদের মতো বিপজ্জনক পদার্থ থাকে। ই-সিগারেটের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলো (Lithium-ion batteries) ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা বেশি তাপের সংস্পর্শে আসলে আবর্জনা ট্রাক এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টে বিস্ফোরিত হয়।

ই-সিগারেটের বর্জ্য গুরুতর পরিস্থিতিতেও বায়োডিগ্রেড করতে পারে না। রাস্তায় ফেলে দেওয়া ই-সিগারেটের কার্তুজগুলো আবর্জনার সাথে মিশে যায় এবং চারপাশের পরিবেশকে দূষিত করে। যখন এর মাইক্রোপ্লাস্টিক ও রাসায়নিক পদার্থ ভেঙ্গে যায় তখন নর্দমায় প্রবাহিত হয়ে পানি এবং প্রকৃতিকে দূষিত করে।

আমাদের দেশে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তামাক কোম্পানি থেকে ৮১৩,৯২৫ পাউন্ড বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য নির্গত হয়েছিল। তামাক চাষ বন উজাড় করে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে। তামাক চাষের জন্য বন উজাড় করে মাটির ক্ষয় এবং ফসল ফলনে ব্যর্থ হওয়া বা গাছপালা বৃদ্ধির জন্য জমির ক্ষমতা হ্রাস করে।

তামাক চাষিরা সাধারণত জমি পুড়িয়ে পরিষ্কার করে। কিন্তু এই জমিটি প্রায়শই কৃষিগতভাবে প্রান্তিক ও মাত্র কয়েক ঋতু পরে পরিত্যক্ত হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে মরুকরণে অবদান রাখে। পোড়ানোর সময় এর ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে এবং মাটিকে বায়ু দূষণ তৈরি করে এর উর্বরতা কমায়। এছাড়া পোড়া বর্জ্য জলাশয়ে গেলে পানিনির্ভর জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এবং বনভূমি হ্রাস করে গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রা বাড়ায় যা অন্যদিকে তামাক উৎপাদনের ফলে ১৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন অক্সিজেন ($CO2$) শোষণ করে। তামাক উৎপাদনে বেশি পানি ও কাঠ ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ফসলের তুলনায় এতে বেশি কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়, যা পানি ও মাটির দূষণকে আরও প্রভাবিত করে। তথাকথিত তামাক শিল্পের জন্য প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন গাছ কেটে ফেলা হয়। তামাক চাষ ও তামাক শিল্পের জন্য বিশ্বের অনেক দেশ বন উজাড়ের জন্য দায়ী।

তথাকথিত তামাক শিল্প প্রতিবছর কয়েক হাজার পাউন্ড সিগারেট ও ই-সিগারেট বর্জ্য তৈরির জন্য দায়ী। সিগারেট ও ই-সিগারেটের বর্জ্য পরিবেশের জন্য গুরুতর হুমকি এবং এর দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রয়োজন। তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে, তামাক কোম্পানিগুলো তামাকজাত দ্রব্যের প্রসারে পরিবেশ সংরক্ষণে তাদের ভূমিকার ইতিবাচক প্রচার করে থাকে।

কিছু তামাক কোম্পানি তাদের টেকসই লক্ষ্যের অংশ হিসেবে পরিবেশে সিগারেটের ফিল্টারের পরিমাণ কমানোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান স্পিরিট ২০২১ সালে একটি নতুন "স্ট্রংগার টুগেদার" স্লোগান এবং ২০২৫ সালের মধ্যে অর্ধ বিলিয়ন সিগারেটের বাট পুনর্ব্যবহারে সহায়তা করার লক্ষ্যের পুনর্নিশ্চিতকরণের সাথে তার "অনুপ্রেরণামূলক" থিমযুক্ত পরিবেশগত মেসেজিং চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল দাবি করেছে যে তারা "আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ নট অ্যাশট্রে" উদ্যোগের অংশ হিসাবে ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক কমানোর চেষ্টা করছে। এ ধরনের প্রচারণা ভন্ডামী ও জনসাধারণের কাছে বিভ্রান্তিকর। তামাক শুধু নতুন বর্জ্য প্রবাহ তৈরি করেনি, তারা তাদের ক্ষতিকর অভ্যাসগুলিকে ভুল দিকনির্দেশনা ও পরিবেশের ক্ষতি ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে।

তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যগুলোর পরিবেশগত নিরাপদ নিষ্পত্তির সুবিধার্থে - দাহ্য ও ইলেক্ট্রনিক উভয় প্রকার বর্জ্যের জন্য দায়ী করা উচিত।

ই-সিগারেটের বর্জ্যের পরিমাণ কমানোর জন্য আর্থিক জরিমানাসহ শক্তিশালী আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। সিগারেট ও ই-সিগারেট সম্পর্কিত বর্জ্য ফেলে দিয়ে পরিবেশগত বিষাক্ততা ও বিপদ সম্পর্কে ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, ধূমপায়ীদের সিগারেট, ই-সিগারেট ও ভেপার পণ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার বন্ধ করতে উৎসাহিত করা হলে তামাকজাত দ্রব্যের বর্জ্য থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায়।

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য করণীয়

আমিনুল ইসলাম বকুল
উপদেষ্টা, ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিজ অফ সোসাইটি (ডাস)

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসটি মূলতঃ তামাকজাত পণ্যের বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য উৎসর্গীকৃত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলি বিশ্বে তামাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৮৭ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসটি পালিত হয়। ধূমপান ও তামাক সেবনের ক্ষতিকারক অভ্যাস ত্যাগ করতে সহায়তা করাও এ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর অর্থ হলো যারা ইতোমধ্যে সিগারেট, বিড়ি বা ধোঁয়াবিহীন তামাকের নেশায় আসক্ত তাদের এ ক্ষতিকর নেশা ত্যাগে উৎসাহিত করা এবং যারা তামাকের নেশা গ্রহণ করেনি তাদের ক্ষতিকর এ নেশা থেকে বিরত রাখা। একইসঙ্গে যারা ধূমপান করে না কিন্তু পরোক্ষ ধূমপানের শিকার তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিও এ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। তামাক সেবনের কারণে পৃথিবীতে বছরে ৮০ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটায়।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্বব্যাপী দিবসটি আগামী ৩১ মে উদযাপিত হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) অনুসারে এ বছরে দিবসটির থীম হলো Tobacco: Threat to our environment অর্থাৎ তামাক আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকি। বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে এর ভাবানুবাদ করা হয়েছে, তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ।

আমরা যখন বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসটির কথা বলি তখন স্বাভাবিকভাবেই এটি বিশ্ব ধূমপানমুক্ত দিবস হিসাবে মনে আসে। আমরা মনে করি যে কীভাবে আমরা লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে ধূমপান বন্ধ করতে উৎসাহিত করতে পারি। কারণ তামাক ব্যবহারের প্রধানতম উপায় হলো ধূমপান। ধূমপানের মূল সমস্যা হলো তামাক জ্বালানো তামাক নিজে নয়। যখন একটি সিগারেট জ্বালানো হয়, তখন তামাক জ্বলতে থাকে এবং ধোঁয়া তৈরি করে যাতে উচ্চ স্তরের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা ধূমপান সম্পর্কিত রোগগুলির প্রাথমিক কারণ। জ্বলন্ত সিগারেট/বিড়ি হতে নিঃসৃত ধোঁয়া অধূমপায়ীর ফুসফুস ক্যান্সার, হার্টের অসুস্থতা এবং হতাশাসহ দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার কারণ হতে পারে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির মতে, ধূমপায়ীদের যখন পরোক্ষ ধূমপানের ধোঁয়া বা পরিবেশগত তামাকের ধোঁয়ায় আক্রান্ত করা হয়, তখন এটিকে অনৈতিক ধূমপান বা নিষ্ক্রিয় ধূমপান বলে।

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য চাষ, বিপণন, ও গ্রহণ এর সর্বস্তরে পরিবেশকে দূষিত করে ফেলে। তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়। তামাক উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক মাটির স্বাভাবিক সক্ষমতা নষ্ট করে। বৃষ্টির পানিতে সার ও কীটনাশক ধুয়ে নদী বা খালের পানিতে মিশে যার ফলে জীববৈচিত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তামাকচাষ ও পরিচর্যায় নিযুক্ত শ্রমিক ও কৃষকদের বিষাক্ত তামাকপাতার সংস্পর্শে বারবার আসার ফলে নানা ধরণের চর্মরোগ তৈরী হয়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরী হয়। নারী ও শিশুরা তামাকপাতা উত্তোলন ও শুকানোর কাজে নিয়োজিত থাকে। তামাকপাতা শুকানোর কাজে বিশেষ করে তামাকপাতা সাজিয়ে একটানা তাপ বজায় রাখতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন বিপুল কাঠ। কৃষকরা এ সময় বিপুল কাঠের জোগান নিশ্চিতে প্রচুর গাছ-পালা কেটে আনে যারফলে পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দেয়। সিগারেট বিড়ি উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে তামাকের গুঁড়া বাতাসের সাথে মিশে বায়ু দূষিত করে। তামাক গাছের গোড়া মাটির সাথে মিশে মাটির স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে। সিগারেটের বাট অপচনশীল প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী করা হয়। সিগারেটের বাট মাটি বা পানির সাথে মিশে পরিবেশ দূষণ করে চলেছে।

আইন অনুসারে, "পাবলিক ট্রান্সপোর্ট" অর্থ মোটর গাড়ি, বাস, ট্রেন, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, সমস্ত ধরণের যান্ত্রিক গণপরিবহন, বিমান এবং অন্যান্য যে কোনও পরিবহণ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা ঘোষিত হয়। আইনের উপর ভিত্তি করে, এই ধরনের পরিবহনগুলি ধূমপান মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবে, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ধূমপান চলছে এবং মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে উঠে। ড্রাইভিং চলাকালীন চালক এবং তাদের সহযোগীরা প্রকাশ্যে সিগারেট খায় যা যাত্রীদের জন্য বিরক্তি সৃষ্টি করে। রাজধানীর গণপরিবহনগুলোতে ধূমপান করা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা বাসে ধূমপান কম করলেও, চালক ও সহযোগীরা নিয়মিত ধূমপান করে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় যে, শতকরা ৬২ ভাগ পরিবহন কর্মীরা এখনও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করে থাকে। বাসে ধূমপান করলে শতকরা ২৯ ভাগ যাত্রীরা প্রতিবাদ করেন। এছাড়া পাবলিক পরিবহনগুলির মধ্যে শতকরা ৬১ ভাগ গাড়িতেই এখন পর্যন্ত ধূমপান বিরোধী স্থায়ী সাইনেজ নেই।
(সূত্রঃ ডাস্ মনিটরিং রিপোর্ট ২০২২, সময়কালঃ ডিসেম্বর'২১ হতে ফেব্রুয়ারী'২২)।

জনস্বাস্থ্যের স্বার্থেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ করে সব ধরণের পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক পাবলিক পরিবহন বিশেষত বাস-টেম্পুর চালকেরা এ আইন লঙ্ঘন করছে বলে লক্ষ্যে করা যায়। কখনও কখনও, বিশ্রামাগারে গাড়ির জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় কোন কোন যাত্রীকে ধূমপান করতে দেখা যায় যা শিশু-নারীসহ অধূমপায়ী যাত্রীদের জন্য অস্বস্তিকর ও ক্ষতিকর।

এছাড়া, যাত্রীরা যখন ড্রাইভার এবং সহযোগীদের ধূমপান বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তারা যাত্রীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অনেক সময় প্রতিবাদকারী যাত্রীরা ড্রাইভার এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়। এসব ধূমপায়ী ড্রাইভার ও তাদের সহযোগীদের পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে আইন প্রয়োগকারীদের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্টের উপর আরও বেশী গুরুত্বারোপ করা উচিত। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সারাদেশে যে পরিমাণ মোবাইল কোর্ট করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। বিশেষ করে বাস টার্মিনালগুলোতে এ বিষয়ে মোবাইল কোর্ট লক্ষ্যে করা যায় না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও বাংলাদেশ পুলিশের সমন্বয় আরও জোরালো করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে রাজধানীর বাস টার্মিনাল ও গণপরিবহনগুলোতে মোবাইল কোর্ট এর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ড্রাইভার ও তাদের সহযোগীদের পরিবহন সংস্থার নির্দেশনার পাশাপাশি বিআরটিএ কে পরিবহনের ফিটনেস প্রদানের সময় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া, বিআরটিসি কর্তৃক ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে গণপরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে কঠোর নির্দেশনা প্রদান এবং পুলিশ বিভাগকে আইন লঙ্ঘনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় হওয়া জরুরী।

গ্যাটস সার্ভে ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে এখনও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার ৩৯% মানুষ এরমধ্যে অধিকাংশই শিকার হয় পাবলিক প্লেসে। বিশেষকরে মানুষ যখন যাতায়াতের জন্য বাস-লঞ্চ ব্যবহার করে এবং টার্মিনালগুলোতে যখন সবাই অবস্থান করে, ডাস্ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, টার্মিনালের শতকরা ৬৮ ভাগ দোকানেই তামাকজাত পণ্য বিক্রি করা হয় যার মধ্যে একটি দোকানেরও তামাকপণ্য বিক্রয়ের কোনো প্রকার লাইসেন্স নেই। এছাড়া শতকরা ৬৩ ভাগ দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছে (সূত্রঃ ডাস্ মনিটরিং রিপোর্ট ২০২২, সময়কালঃ সেপ্টেম্বর'২১ হতে নভেম্বর'২১)। টার্মিনালগুলোর সার্বিক পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব টার্মিনাল গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। টার্মিনালগুলোয় যত্রতত্র থুতু ও কফ ফেলা, পানের পিক ফেলা খুবই সাধারণ বিষয় এবং তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে টার্মিনালের পরিবেশ উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, ইজারাদার, বাস-মালিক কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ইউনিয়ন একসাথে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে। এর পাশাপাশি টার্মিনালগুলোতে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পয়েন্ট অব সেল কমাতে হবে। মোবাইল ভেন্ডরদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। তামাক বিক্রয়ে আলাদা বিক্রয় লাইসেন্স আরোপ করতে হবে। টার্মিনালগুলোর পরিবেশ উন্নয়নে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য বিআরটিএ ও বিআইডব্লিউটিএ -এর এনফোর্সমেন্ট শাখাগুলোকে কাজে লাগাতে হবে এবং ট্রাফিক সার্জেন্টদেরকে জরিমানা আরোপের ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

আমরা মনে করি যে, বিআরটিএ, বিআরটিসি, বিআইডব্লিউটিএ সহ সরকারি সংস্থাগুলো নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়নে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করলে এবং সে অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে আমরা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গণপরিবহন সেক্টরটিকে ধূমপানমুক্ত করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি।

পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়

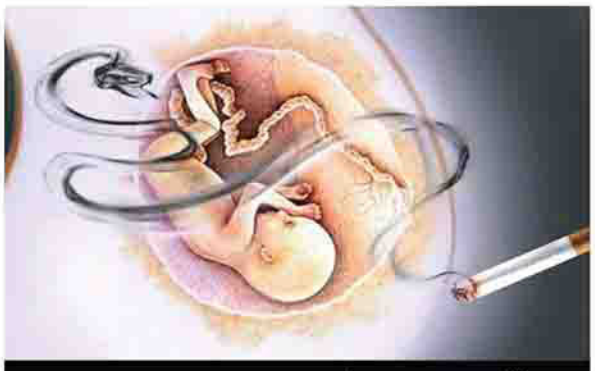

পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা

শাগুফতা সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্দ্ধে ৩৫.৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে, যার মধ্যে ৪৬% পুরুষ এবং ২৫.২% মহিলা। বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান না করেও পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছে বহু মানুষ। এই হার কর্মক্ষেত্রে ৪২.৭%, রেস্তোরায় ৪৯.৭%, সরকারি কার্যালয়ে ২১.৬%, হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ১২.৭% এবং পাবলিক পরিবহনে ৪৪%।

তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ফ্রেমওর্য়াক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে চুক্তিকে অনুসমর্থন করে। তার ধারাবাহিকতায় সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে।

৩০-৩১ জানুয়ারী, ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত South Asian Speakers Summit এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দেন। দেশের ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ অর্জনে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি'র বাস্তবায়ন ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এ লক্ষ্যে এইড ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসিডিসহ বিভিন্ন সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যকর ভূমিকায় জানুয়ারী ২০২১ এ 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' প্রকাশিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ) নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২ মার্চ ২০২১ এ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের (বিশেষকরে সিগারেট/বিড়ি) যত্রতত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বিক্রয় সীমিতকরণে 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' ঘোষণার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ নির্দেশিকা'র ৮ এর ৮.১ এ বলা হয়েছে, 'তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে তার জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা এবং প্রতি বছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা।'

লাইসেন্সিং বলতে আমরা কী বুঝি? লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর করা অর্থ শুধু বৈধতা প্রদান নয়। তারচেয়েও বেশি, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। Investopedia তে বলা হচ্ছে, 'Such a license is a mechanism for government to oversee and in many cases tax, certain business operators. A liquor is an example of this type'.

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও বিক্রি কমিয়ে আনতে অন্যতম একটি পদক্ষেপ লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে বিক্রয়কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ। বর্তমান অবস্থায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই। লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রচেষ্টা এর বিক্রয়কে সীমিতকরণ করতে সাহায্য করবে। বিক্রয় সীমিত করা সম্ভব হলে ব্যবহারও কমে আসতে বাধ্য। লাইসেন্সিং এর বিষয়ে নির্দেশিকায় যে সমস্ত শর্তারোপ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিপালন যদি নিশ্চিত করা যায় তবে তামাকজাত দ্রব্যের (বিশেষকরে সিগারেট/বিড়ি) যত্রতত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয় সীমিতকরণে সরাসরি প্রভাব পড়বে।

লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকরের মাধ্যমে একটি শহরে মোট কতোটি দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় হচ্ছে তার ডাটা বেজ তৈরি হয়ে যাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। ইতিমধ্যে এইড ফাউন্ডেশন লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের একটি বিভাগীয় শহর ও ০৯ টি জেলা সদরে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। এই জরিপের মাধ্যমে উল্লেখিত এলাকাগুলিতে কতো সংখ্যক তামাকজাত দ্রব্যের দোকান আছে সেগুলির একটি তালিকা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে যে সমস্ত দোকান আইনভঙ্গ করে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে; সেক্ষেত্রে কী ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে তার তালিকা, দোকানের মালিকের নাম, চলমান দূরাভাস নাম্বার, দোকানের ঠিকানাসহ মূল তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে।

এই সকল তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্ক ফোর্স কমিটি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) এর কাছে জমা দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করা অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে খুলনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলা সদর শহরে। জেলা টাস্কফোর্স কমিটি উক্ত তালিকা অনুসারে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে নড়াইল ও মেহেরপুর জেলা সদরে বিজ্ঞাপন প্রচারণার হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভাগুলি উক্ত তালিকা অনুসারে তামাক বিক্রেতাদের পৃথক লাইসেন্সিং ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের শর্ত সাপেক্ষে পৃথক লাইসেন্স প্রদান করছে। এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনসহ জেলা সদরের অবশিষ্ট পৌরসভাগুলি আগামী অর্থ বছর থেকে লাইসেন্স প্রদান করার জন্য প্রাথমিক কাজগুলি সম্পাদন করেছে। ঢাকার পাশে মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর ও ধামরাই পৌরসভা এইড ফাউন্ডেশনের তৎপরতায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সাভার পৌরসভায় আগামী অর্থবছর থেকে লাইসেন্স ইস্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পৌর কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে লফস (স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠন) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তামাক বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনার লক্ষ্যে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম শুরু করেছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সচিব এ জরিপ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

নির্দেশিকায় ৮.৫ এ বলা হয়েছে, সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। তামাক কোম্পানীগুলোর অন্যতম টার্গেট থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে যাতে সিগারেট বিক্রি হয় তার ব্যবস্থা করা। তারা প্রধান ভোক্তা বানাতে চায় শিশু-কিশোর-যুবকদের। কারণ তাদের একবার সিগারেট ধরিয়ে দিতে পারলে দীর্ঘ মেয়াদী ভোক্তা তৈরি হয়ে যায়। গাইডলাইনের উল্লেখিত ধারা বাস্তবায়িত হলে তামাক কোম্পানীর এই অপতৎপরতাকে বাধাগ্রস্থ করা সম্ভব হবে।

নির্দেশিকার উল্লেখিত ধারা বাস্তবায়নের জন্য খুলনা বিভাগের জেলা শহরগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তামাক বিরোধী ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বড় করে 'নো স্মোকিং সাইনেজ' স্থাপন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়। ফলে নির্দেশিকার উল্লেখিত ধারা বাস্তবায়নে এটা খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশ থেকে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সহায়তায় জেলা শিক্ষা অফিস তামাকজাত দ্রব্যের দোকান অপসারণ করে।

সাধারণ ট্রেড লাইসেন্স এবং তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পৃথক লাইসেন্সিং ফি কার্যকর করার ফলে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে বিক্রেতা নিরুৎসাহিত হচ্ছে। অর্জিত ফি'র অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন করতে পারছে। এইড ফাউন্ডেশনের তৎপরতায় উল্লেখিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলি তাদের আগামী অর্থ বছরের বাজেটে আয়ের অন্যতম একটি উৎস হিসাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের নতুন লাইসেন্স ইস্যু 'ফি' এবং নবায়নকে চিহ্নিত করেছে। এবং এখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অনেক রাজ্যে, নেপালেও অনেক পূর্বেই চালু হয়েছে। বর্তমানে ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। এর কার্যকারিতার প্রভাব ইতিমধ্যে এ সমস্ত দেশে দেখা যাচ্ছে। BMJ জার্নালে প্রকাশিত তথ্যানুসারে, লাইসেন্সিং ব্যবস্থার কারণে ফিনল্যান্ডে পয়েন্ট অফ সেলের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ২৮%, ক্যালির্ফোনিয়া কাউন্টিতে ৩১% এবং হাঙ্গেরিতে ৮৩%। অস্ট্রেলিয়াতে লাইসেন্স ফি ১৩ ডলার থেকে বাড়িয়ে ২০০ ডলার করায় খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা এক ধাক্কায় কমে গেছে ২৩.৭%। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ৮%, ফিলাডেলফিয়াতে ৯.৮% হ্রাস পেয়েছে।

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি সীমিতকরণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রভাব তৈরি করায় তামাক কোম্পানীগুলি মরিয়া হয়ে নানা ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে, যাতে নতুন করে কোন দেশে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর না হতে পারে এবং যেসমস্ত দেশে কার্যকর হয়েছে সেখানে যাতে এটি কার্যকর না থাকতে পারে। ইউরোপের নরওয়ে ও স্কটল্যান্ডে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু করলেও কোম্পানীর কূটকৌশলে সেটি অকার্যকর হয়ে যায়।

বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কূটকৌশল গ্রহণ করেছে। নীতিনির্ধারক মহলকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তারা অনুধাবন করেছে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হলে বিক্রি সীমিত হয়ে আসতে বাধ্য। কারণ দেশের বেশ কিছু পৌরসভায় লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং বিক্রি সীমিতকরণে যা ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করছে।

এই পুরো কর্মকান্ডে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আমাদের অভিভাবক জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে জেলা টাস্কফোর্স কমিটিকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করায় সামগ্রিক কাজ অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতি আহ্বান, দেশের জনস্বাস্থ্যকে রক্ষায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করার জন্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা আমাদেরকে পথ দেখাবে।

কেন বিশ্বের অষ্টম শীর্ষ তামাক ব্যবহারকারী দেশ বাংলাদেশ?

সুশান্ত সিনহা, বিশেষ প্রতিনিধি, একাত্তর টেলিভিশন

তামাক নিয়ন্ত্রণে গত কয়েক বছর ধরে সরকারি-বেসরকারি চলমান উদ্যোগে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। সিগারেট প্যাকেটের ৫০ শতাংশ জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কতামূলক ছবির ব্যবহারসহ আইন-বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন হয়েছে। তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনসহ বেশ কিছু উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০০৯ ও ২০১৭ সালের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার পরও গত ১০ বছরে সার্বিকভাবে তামাক ব্যবহারকারী কমেছে ৮ শতাংশ।

গ্যাটসের প্রতিবেদন বলছে, ২০০৯ সালে ১৫ বছরের উর্ধ্বে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সবধরনের তামাক ব্যবহারকারীর হার ছিল ৪৩.৩ শতাংশ। যা ২০১৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩ শতাংশে। বাংলাদেশের এ অর্জন ভাল, কিন্তু সন্তোষজনক নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় তামাক ব্যবহারের হার কমিয়ে আনতে আরও অনেকটা পথ বাকী রয়েছে। সহজ কর কাঠামো, ই-সিগারেট-হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্ট ব্যবহার নিষিদ্ধসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর বাস্তবায়নে ভারতসহ অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হওয়ায় ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে পুরো ভারতে সবধরনের ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করে দেশটির সরকার। বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে বাড়ছে ভ্যাপসহ ইলেকট্রিক বা ই-সিগারেটের ব্যবহার ও ব্যবসা। তরুণরা নিত্য নতুন মোড়কে ই-সিগারেট দেখে আকৃষ্ট হচ্ছে। ই-সিগারেট খুব দ্রুত বাংলাদেশ নিষিদ্ধ করা জরুরি।

জনসংখ্যার বিবেচনায়, বিশ্বের শীর্ষ দুই দেশ, চীন ও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের সেবনকারীর হার এখনও অনেক অনেক বেশি। গ্যাটসের ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সী ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করে। যা মোট জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩%! এ কারণে বিশ্বের অষ্টম শীর্ষ তামাক ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ'র এক তথ্যে এ চিত্র পাওয়া যায়।

FIGURE 4. **TOP 10 CIGARETTE MARKETS BY VOLUME**

COUNTRY	RETAIL VOLUME, 2017 (BN STICKS)
China	2,368.9
Indonesia*	308.2
Russia	258.9
USA	252.7
Japan	151.4
Turkey	106.2
Egypt	93.1
Bangladesh	88.9
India	81.3
Germany	79.0

*excluding hand-rolled kreteks

Source: Euromonitor International, 2018

Here are the 10 countries with the highest smoking rates:

1. Nauru (52.10%)
2. Kiribati (52.00%)
3. Tuvalu (48.70%)
4. Myanmar (45.50%)
5. Chile (44.70%)
6. Lebanon (42.60%)
7. Serbia (40.60%)
8. Bangladesh (39.10%)
9. Greece (39.10%)
10. Bulgaria (38.90%)

তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সংস্থা ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর তথ্যে দেখা যায়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের দেশ চীনে তামাক সেবনকারীর হার ২৬.৬ শতাংশ। আর প্রতিবেশি ভারতের এই হার ২৮.৬ শতাংশ। ২০ কোটি মানুষের দেশ পাকিস্তানে এই হার ১৯ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানই বলছে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণে এখনও কতটা পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।

অথচ পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলাদেশ, যেখানে তামাকমুক্ত দেশ গড়ার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ (ব্যবহার ৫ শতাংশের নিচে নামলেই ধরা হয় তামাকমুক্ত দেশ) গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্বের অন্য কোনো সরকার প্রধান এমন অঙ্গীকার করেননি। শুধু ঘোষণা নয়, তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে ঘোষিত রোডম্যাপ বাস্তবায়নে করণীয় তুলে ধরেছেন, যা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় স্পীকারদের শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

- "প্রথম পদক্ষেপে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহার করে একটি তহবিল গঠন করা-যা দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- দ্বিতীয় ধাপে, আমরা তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং একইসাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা।
- সর্বোপরি, আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের সাথে মিল রেখে আমরা আমাদের আইনগুলোকে FCTC'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করব।"

সিগারেটের বিদ্যমান চার স্তর বিশিষ্ট জটিল কর কাঠামো তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে এবং তামাকখাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে বড় অন্তরায় - তা অনুধাবন করেই সরকার প্রধান শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি প্রণয়নের তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু ৭ বছরে সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারের সংস্থা-মন্ত্রণালয়গুলোর আশাব্যাঞ্জক কোনো অগ্রগতি নেই। তামাকমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে আর মাত্র ১৮ বছর হাতে আছে, তাই এখনই শক্তিশালী কর কাঠামো ও আইনী সংস্কার করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন কঠোরভাবে শুরু করতে জোরোশোরে উদ্যোগ নেয়ার বিকল্প নেই। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ কেবল জনসংখ্যার বিবেচনায় তামাক সেবনে অষ্টম শীর্ষস্থানীয় নয়। বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম শীর্ষ সিগারেট উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর বাড়ছে সিগারেটের উৎপাদন। সেই সাথে বাড়ছে বিড়ি, জর্দা-গুলের উৎপাদন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭ হাজার ১৮৭ কোটি শলাকা সিগারেট বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৯ কোটি ৭৫ লাখ সিগারেট বিক্রি হয় বাংলাদেশে। চার স্তর বিশিষ্ট সিগারেটের মধ্যে প্রিমিয়াম স্তরে ৫৯৩ কোটি শলাকা, উচ্চ স্তরে ৫৬৭ কোটি শলাকা এবং মধ্যম স্তরে ৬০৩ কোটি শলাকা সিগারেট বিক্রি হয়েছিল ঐ অর্থবছরে। আর নিম্ন স্তরের সিগারেট বিক্রির পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৪২৪ কোটি শলাকা। যা মোট সিগারেটের ৭৫ ভাগই নিম্ন স্তরের। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিক্রিত নিম্ন স্তরে কম রাজস্ব পায় এনবিআর। কারণ নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম খুবই কম। বিশ্বের কোথাও এত কম দামে সিগারেট পাওয়া যায় না। আবার এই কম দামের সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্কসহ করভার বেশ কম। ফলে খুবই সস্তা হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষের মধ্যে সিগারেট সেবনের প্রবণতা বাড়ছে। বিপরীতের কাঙ্খিত রাজস্ব পাচ্ছে না সরকার।

বর্তমানে নিম্ন স্তরে ১০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৩৯ টাকা পাশ। সরকারি হিসাবে ১০ শলাকার সিগারেট প্যাকেটের হিসাব করা হলেও কোম্পানীগুলো বিক্রি করে ২০ শলাকার প্যাকেট। নিম্ন স্তরে ২০ শলাকার প্যাকেটের দাম ৭৮ টাকা। এ দামের মধ্যে রয়েছে সম্পূরক শুল্ক বা এসডি ৫৭%, মূল্য সংযোজন কর-মূসক ১৫% এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১%; মোট করভার (৫৭%+১৫%+১%)=৭৩ শতাংশ। ওপরের তিন স্তরে সম্পূরক শুল্ক ৬৫%সহ মোট করভার ৮১%। এ কারণে সর্বাধিক বিক্রিত নিম্ন স্তরের সিগারেটে কোম্পানিগুলো অতিরিক্ত ৮% মুনাফা করছে। টাকার অংকে ২০ শলাকার এক প্যাকেটে নিম্ন স্তরের সিগারেটের খুচরা মূল্য ৭৮ টাকার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তথা সরকার রাজস্ব আয় করে ৭৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫৭ টাকা। বাকী ২১ টাকা থাকছে কোম্পানির খরচসহ মুনাফার অংশ। এখানে ভিত্তিমূল্য কম হওয়ায় নিম্ন স্তরের সিগারেট সস্তা থাকছে, সরকার রাজস্ব কম পাচ্ছে এবং এ কারণে দরিদ্রদের মধ্যে এর ব্যবহার বেশি।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ অনুযায়ী উপরের তিন স্তরের মতো নিম্ন স্তরেও সম্পূরক শুল্ক ৬৫% করে মোট করভার হবে ৮১%, ফলে সরকার রাজস্ব পাবে ৬৩ টাকা, যা এখন পায় ৫৭ টাকা। শুধু সম্পূরক শুল্ক বাড়ালেই নিম্ন স্তরে প্রতি প্যাকেটে বাড়তি রাজস্ব পেত ৬ টাকা, অর্থাৎ বছরে ২৭১ কোটি ২৯ লাখ প্যাকেটে সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব পাবে ১ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সিগারেটের মোট বিক্রির ৭৫ শতাংশই নিম্ন স্তরের সিগারেট। সংখ্যায় ৫ হাজার ৪২৪ কোটি শলাকা। নিম্ন স্তরে করভার ৮১% করা হলে সরকারের রাজস্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, একইসাথে কোনো ধরনের খরচ ছাড়াই কোম্পানির বাড়তি মুনাফা করার সুযোগ থাকতো না।

সিগারেটের চার স্তরের মধ্যে প্রিমিয়াম ও উচ্চ স্তর - এ দুই স্তরকে 'উচ্চ স্তর' নামে একটি স্তর এবং মধ্যম ও নিম্ন স্তর দুটিকে 'নিম্ন স্তর' -এ একীভূত করা জরুরি। এরপর, দুই স্তরের ওপরে অভিন্ন করভার আরোপ করার পাশাপাশি প্যাকেট প্রতি সুনির্দিষ্ট কর বা স্পেসিফিক ট্যাক্স আরোপ করা হলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে এবং তামাকের দাম কমে আসবে। বর্তমানে মোবাইল ফোনের সিম কার্ডের ওপর স্পেসিফিক ট্যাক্স রয়েছে। ঠিক একইভাবে সিগারেটের প্রতি প্যাকেটে বিদ্যমান দাম ও করের সাথে বাড়তি প্রতি প্যাকেটে ৫ টাকা করে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে সরকার ২ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব পাবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এতে সব সিগারেটের প্যাকেট প্রতি দাম ৫ টাকা করে বাড়বে, যার পুরোটায় সরকারের কোষাগারের যাবে। বিশ্বের অনেক দেশেই এভাবে প্যাকেট প্রতি সুনির্দিষ্ট কর আরোপের মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি রাজস্ব বাড়িয়েছে।

একইভাবে বিড়ি, জর্দা ও গুলের ওপর সুনির্দিষ্ট কর বসিয়ে উৎপাদন নজরদারি করলে এখান থেকে বাড়তি হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় আসতে পারে। বর্তমানে জর্দার ওপরে ন্যূনতম ১০ গ্রাম ওজন ধরে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে ৫৫ শতাংশ সম্পুরক শুল্ক, ১৫ শতাংশ মূসক এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল আছে। জর্দার মতো ৭১ শতাংশ করভার আছে ২০ টাকা মূল্যের ১০ গ্রামের গুলের ওপর। কিন্তু বাজারে জর্দা-গুলের বিক্রি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা হলেও এ খাতে রাজস্ব আসে নামমাত্র। বছরে পঞ্চাশ কোটি টাকাও রাজস্ব পায় না সরকার। বাজারে বিক্রিত চার শতাধিক ব্র্যান্ডের জর্দার মধ্যে বেশিরভাগই কৌটা ও প্যাকেটের গায়ে দাম উল্লেখ থাকে না। এতে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ অবারিত হয়েছে। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যে নজরদারি বাড়ালে এখন থেকে শত শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব পাবে সরকার।

এজন্য করণীয় হিসাবে, সবার আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বন্ধ থাকা টোব্যাকো ট্যাক্স সেল বা তামাক কর সেলের পুনরায় চালু করা জরুরি। কারণ তামাক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকি বন্ধে তামাক সেলের সক্রিয়করণ হতে পারে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সিগারেটসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বা এমআরপি নির্ধারণ করে দিয়েছে এনবিআর। এমআরপি বা প্যাকেটের গায়ের দামে কিনবে ভোক্তারা। কিন্তু বছরের পর পর এমআরপি আইন ভঙ্গ করে সিগারেট কোম্পানিগুলো তাদের এজেন্টের মাধ্যমে খুচরা দোকানীদের কাছেই এমআরপি রেটে সিগারেট বিক্রি করছে। ফলে খুচরা বিক্রেতারা ক্রেতা/ভোক্তাদের কাছে প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করা দামের চেয়ে বাড়তি দামে সিগারেট বিক্রি করছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ কোটি সিগারেট বিক্রি হয়। অর্থাৎ সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ২০ কোটি টাকা জনগণের কাছ থেকে বাড়তি আদায় করছে। বছরে যা ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে পেতো সরকার। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের দেখা প্রয়োজন। এনবিআরের তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল থাকলে তারা এমআরপি আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে পারতো। এতে রাজস্ব ফাঁকি কমতো অনেকাংশে।

২০৪১ সালে উন্নত দেশ হতে হলে দেশের আপামর জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। তাই হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ নানা প্রাণঘাতী অসংক্রামক রোগের হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাতে তামাকের ব্যবহার কমাতে হবে কার্যকরভাবে। ২০৪০ সালে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, ই-সিগারেটসহ সবধরের তামাক পণ্য। অকালমৃত্যু হাত থেকের লক্ষাধিক মানুষের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি পরিবেশ-কৃষি জমিসহ দেশে তামাকজনিত ক্ষতি বছরে ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ১ দশমিক ৪ শতাংশ। ফলে তামাকজনিত দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি বন্ধ করতে পারলেই প্রতিবছর দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ বাড়বে। ২০৪১ সালের উন্নত দেশে পরিণত হওয়া অনেকটাই সহজ হবে বাংলাদেশের। তামাককে রুখতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে, এখন এনবিআরসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-নীতি নির্ধারকেদের উদ্যোগী ভূমিকা একান্ত কাম্য সবুজ-শ্যামল সোনার বাংলাদেশের।

লেখক: বিশেষ প্রতিনিধি, একাত্তর টেলিভিশন এবং জনস্বাস্থ্য ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক, sinhasmp@yahoo.com

Cultural acceptance of smokeless tobacco deserves countercultural measures*

Professor Dr. M Mostafa Zaman, Aminul Islam Sujon and Dr. Ferdous Hakim

Highlights

1. Bangladesh is one of the highest consumers of smokeless tobacco (SLT) globally. Around one in four adults use SLTs.
2. SLTs use has been deeply embedded into the culture over the last 2000 years, partly through religious belief.
3. Society has glamourized it through many popular songs, dramas, movies, poems, and novels.
4. It is believed to be beneficial for health, e.g., good for digestion and toothaches.
5. Simple legislative measures are not enough to counter an epidemic; appropriate countercultural measures are needed.

Introduction: Smokeless tobacco (SLT) use has a long history in this part of the world, which started with perceived health benefits (Charlton A., 2004). SLT could continue its initial good image despite evidence that it has links to many killer diseases such as cancers (Khan Z, Tönnies J, and Müller S.) and cardiovascular disease (Boffetta P, Straif K, 2009). The Global Adult Tobacco Survey indicates that about one in five adults in Bangladesh use SLTs (GATS 2017).

The control of SLTs is problematic because it has cultural and religious implications for many people (Zaman MM et al., 2010). Its control measures have been neglected historically (Mehrotra R, Kaushik N, Kaushik R, 2020). It came under the purview of the tobacco control legislation only in 2013. Because of its cultural roots, its control measures should be aligned with countercultural actions. Simple legislative steps may not work adequately.

SLT burden: Bangladesh is one of the highest consumers of SLTs. There are approximately 22 million (20.6%) SLT users in Bangladesh [Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017]. The prevalence of current SLT consumption is higher in women, rural areas, and people with socioeconomic deprivation, such as lower wealth indices and educational achievements **(Figure 1)** (GATS 2009 and 2017). Various SLTs are popular in Bangladesh: Zarda, Paan masala (with tobacco), and Gul. Sada Pata use has been reduced substantially in recent years. Zarda is typically flavored with cardamom and saffron and is often chewed in betel quid, among other SLT applications (Czoli CD, Fong GT, Mays D, et al, 2017).

Fig1: SLT use according to education (left panel) & wealth indices (right panel), Global Adult Tobacco Survey 2017

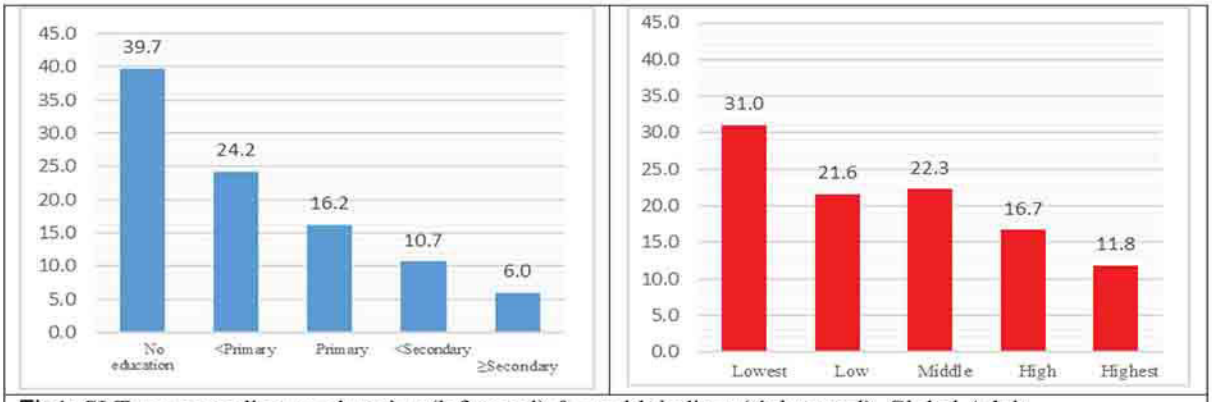

Fig1: SLT use according to education (left panel) & wealth indices (right panel), Global Adult Tobacco Survey 2017

Brief history: Chewing betel quid (betel leaf mixed with areca nut, slaked lime, and Khoyer) known as 'Paan' had been used very popularly in Bangladesh (the then India) even 2000 years ago before the introduction of tobacco by the Europeans. Moroccan traveler Ibne Batuta in the 13th century, saw that Paan was common in the Indian subcontinent (including the present Sylhet, Sonargoan, and Chattogram in Bangladesh).

Currently a predominantly Muslim country, it has vestiges of its Hindu and Buddhist cultural roots (Gupta PC, Ray CS, 2003). Paan is one of the eight bhogas (enjoyments) of life in Hindu culture. Buddhist monks also used Paan in their monasteries. Therefore, Paan has become part of our hospitality and courtesy. In the remote past, it was considered rude to decline an offering of Paan.

The Portuguese introduced Nicotine tobacco (Nicotiana rustica), a related species of common tobacco (known as Virginia tobacco), in Bangladesh around 1508 (Chaly PE. 2007). This Virginia tobacco from the USA was introduced to India in 1920. During that era, Europeans were welcomed by Indians by offering Paan as a symbol of courtesy and respect. However, they experimented by adding tobacco leaf to it, which ultimately led to the current days SLT epidemic.

Paan and chewing tobacco became popular in society during the Mughal period (Arora M., 2003), which spread to the Indian sub-continent as an obligatory social custom. Paan stains on lips and teeth were considered a mark of beauty for women and wealth for men in those days. By 1617, its use had become so popular among all classes that Mughal Emperor Jahangir issued a decree forbidding its use to eradicate the spitting menace (Arora, M., 2003). One can easily understand that the decree did not work well.

According to Central Tobacco Research Institute, India, Tobacco cultivation started in this part of the world in the early 16th Century. Shortly tobacco appeared as an important cash crop in Bengal (current Bangladesh and West Bengal in India). Rangpur region of the then Bengal was the most popular place for tobacco cultivation.

Cultural roots: Sada pata (dried tobacco leaf) or Zarda (smashed tobacco) with betel quid (Paan) became part of Bengali culture a long time back, which gained a high level of social acceptance. Paan was introduced more than 2000 years ago (Lee S., Travels of Ibne Batuta). In the Sanskrit language, Paan, supari, and Khoyer (it makes lip red) are combinedly called Tambul. 'Tambul was mentioned in Sri Krishna Keerton, written by Boru Chandidas. Tambul was the first gift in the Radha-Krishna love affair (Somoyer Kanthaswar, 11 August 2014). Tobacco was familiar in India from quite an early period, even before the 17th century.

In the Srimadvagbat Gita – a religious book of Hinduism – betel leaf is mentioned (Mehreen T., 2016). Therefore, betel quid and betel nut (Supari) has been used in prayer. In Buddhism, Paan-supari has been common in the celebration of Seeblee Puja (Barua J.). An indigenous group named Khasia believes that 'Paan-supari' is holy (Barua J. nirvanapeace.). Great Bengali Muslim poet in the medieval age, Alaol, mentioned tambul (Paan-Supari-Khoyer) in his poem.

Paan is common in Bengali literature (Arif Ahmed, 2013) (such as poems, novels, stories, etc.), music (song, lyrics) [Runa Laila, Pan khaiya thot lal korilam] film, and drama dominating the cultural admixture of Bangladesh. Paan is usually served with SLTs in Bangladesh. Chewing of Paan with SLT has been portrayed fashionably and attractively in literature, music, drama, and films even in the recent past. Manufacturers exploit these avenues to promote their products.

Though society rebukes smoking in front of senior family members, teachers, or seniors in the community, it accepts chewing of SLTs with betel quid. It is expected to serve Paan to the guests after a meal or snacks. No family gatherings or events like wedding ceremonies will go unserved with Paan. It is widely believed to have health benefits such as improved oral health, relief of toothache, and better digestion. Many women start SLT in their pregnancy to relieve pregnancy-induced nausea. Some believe that SLTs will facilitate effortless labor. Due to cultural acceptance (Huque R, et al, 2017), Paan with SLT is provided freely to election campaigns. Many still believe that SLTs are not harmful at all.

The tobacco industry exploits the religious feeling of the people. Packages of tobacco products can have nothing in contravention of the rules of the tobacco control act. SLT companies frequently violate this provision of the law. They use texts to give a positive connotation to the products. They use words like halal, Arabic alphabet, and Muslim religious brand names to lure more customers in this predominantly Muslim country.

Countercultural actions: The use of SLT is one of the alarming issues for Bangladesh but control measures to regulate these products are inadequate. Challenges are multiple. Therefore, the actions needed should be multifaceted. Considering the cultural acceptance, the control measures aligned with the cultural streams of the Country.

The creation of public awareness is central to all control measures. However, one must keep in mind that SLT use with Paan has been trapped in the net of some people's religious beliefs. Therefore, tactful public education without hurting any group of believers. Engagement of religious leaders in the SLT control movement is necessary. Songs and music can better counter the glamour created by popular songs. Drama and movies should play the roles to deglamorize it. Popular social media can be tactfully used to reach the new generation. Serving "Paan" should be discouraged in wedding ceremonies and other festivals. The help of school curricula will be necessary to set a long-term norm for society. Innovative graphical health warnings may help, but we need more research.

More involvement of programs such as NCDC, adolescent and child health, and maternal health are necessary. Engagement of civil society organizations all over the country is needed to become able to face the challenges of cultural acceptance. Engagement of the non-health sector needs to be increased for measures such as the cultivation and smuggling of SLTs. NTCC should be able to exploit its main strength of being located among the bureaucrat administration and delegate more actions to others.

Cessation services: Countercultural efforts will largely reduce new uptakes of SLTs. It may not have a significant impact on those who are already addicted. Therefore, a large pool of users will persist for a long time, even after implementing countercultural measures. They will need cessation support to quit, especially if their addiction level is high.

There are negligible initiatives on SLT cessation. Simple counseling at the first contact in health facilities can substantially favor tobacco cessation (Zaman, M. et al., 2016). Bangladesh has many union- and community-level health centers in the public sector. In addition, there are many NGO health facilities at the grassroots level that could be utilized for tobacco cessation simply by counseling.

Ekhlaspur Center of Health (ECOH) is a grass-root-level health center that provides services for villagers. It runs a Hypertension Clinic on an outpatient basis. Many people take the screening services to know their blood pressure and glucose levels. Many known hypertensives are registered for periodic follow-up. Brief counseling by the no-doctor staff could drastically reduce tobacco use, particularly SLTs.

Figure-2 indicates that counseling at the first contact is most important. The use of SLTs dropped from 33% to 11% in the second visit after one month of first contact (Zaman MM, et al., 2016). Therefore, this model can be considered for the community clinics to cover a larger number of people.

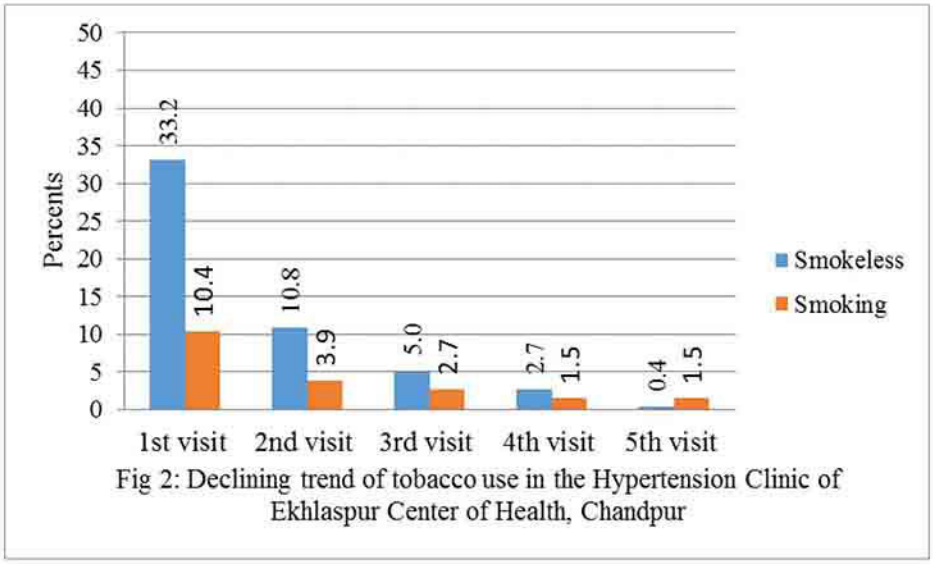

Fig 2: Declining trend of tobacco use in the Hypertension Clinic of Ekhlaspur Center of Health, Chandpur

Conclusion: SLT epidemic backed by cultural acceptance warrants engagement of the whole of the society, the whole government. It would, otherwise, be difficult to uproot this popular practice that people enjoyed for a long time. Industry monitoring should be more rigorous to prevent them from fueling cultural acceptance. Its high affordability must be shattered concomitantly. Grass-root-level organizations such as community clinics and NGO health centers could be engaged for counseling. This could work better if tagged with services like hypertension, diabetes, and ANCs.

Disclaimer: The authors alone are responsible for the views expressed in this article and they do not necessarily represent the views, decisions or policies of the institutions with which they are affiliated.
*References can be obtained from hakimf@who.int

Writers: Professor Dr. M Mostafa Zaman, WHO Bangladesh. Email: zamanm@who.int, Aminul Islam Sujon, National Tobacco Control Cell, Health Services Division and Dr. Ferdous Hakim, WHO Bangladesh. Email: hakimf@who.int

Importance of a Tobacco Tax Policy in Bangladesh

Rumana Huque
Professor, Department of Economics, University of Dhaka

Raising taxes on tobacco is the most cost-effective measure for reducing tobacco use. Evidence shows that a well-administered tobacco tax leads to the desired result of reducing consumption particularly among youth and the poor. They also reduce the health and economic devastation caused by tobacco. At the same time, raising tobacco taxes can bring in new revenues to finance health and development efforts. However, raising taxes may not lead to increase in prices, and the tax structure, which determines the type of the tax imposed on tobacco products and how it is collected, can make a significant difference in how a tax increase raises tobacco prices.

Though taxation is the most effective and cost-effective way of tobacco control, Bangladesh could not achieve expected results for its faulty taxation system. Due to the complex multi-tiered ad-valorem tax structure, cigarettes are remaining cheap and affordable. As a result, smokers are switching to cheaper cigarettes instead of quitting. Variation of the type of tobacco product (cigarettes, biris, and smokeless tobacco) has made the situation more challenging. Low taxes and prices on biris and smokeless tobacco keep these products highly affordable. In Bangladesh, myths regarding revenue earnings from tobacco tax, and weak tax administration result in low tobacco taxation. Moreover, ad-valorem tobacco tax structure is the cause of unexpected profit growth of tobacco industries.

In the South Asian Parliamentary Speakers' Summit- 2016, the Honorable Prime Minister of Bangladesh expressed her commitment to make the country tobacco free by the year 2040. In order to achieve the target, the honourable Prime Minister emphasized on the formulation of a comprehensive national tobacco tax policy. It is therefore the high time to take the initiative to formulate and enforce a national tobacco tax policy in Bangladesh to reduce tobacco consumption and achieve the target of making the country tobacco free in next 18 years.

Objectives of a Tobacco Tax Policy:

The government of Bangladesh is facing multiple difficulties including tax evasion in consequence of the existing complex, multi-tiered tax structure and the inadequacy of the tax collection and monitoring system. A comprehensive tobacco tax policy could be the wisest decision for the government to protect public health as well as to generate the expected revenue. Though different policies, acts and regulations are in place in Bangladesh, which can directly and/or indirectly influence tobacco tax, a comprehensive 'Tobacco Tax Policy' is needed, which can be a fundamental guideline describing a set of general plans of actions in order to:

i. Improve public health outcomes
ii. Make Bangladesh tobacco free by 2040
iii. Be effective in reducing tobacco consumption considerably, especially among the youth, as well as increase government revenue significantly
iv. Discourage brand switching or product switching
v. Reduce opportunities for manufacturers to avoid a tax
vi. Tackle illicit trade
vii. Be administratively simple to implement
viii. Strengthen tax administration

A multispectral approach is needed for tobacco control, and the tobacco tax policy can be formulated to ensure synergy among all stakeholders.

Tobacco tax policy: a brief overview

The tobacco tax policy can address the following issues.

Imposing specific tax on tobacco products

1 Rodriguez-Iglesias G and Blecher E. Tax Structures are Key in Raising Tobacco Taxes & Revenues. A Tobacconomics Policy Brief. Chicago, IL: Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, 2018

Tobacco tax policy: a brief overview

The tobacco tax policy can address the following issues.

Imposing specific tax on tobacco products

The complicated tiered ad valorem cigarette tax structure, with a low base price for each tier, has made tobacco tax a less effective instrument to control tobacco use in Bangladesh and created an opportunity for manufacturers to avoid taxes. Globally, 66 countries practicing specific only excise taxation system. Of them 19 from higher income countries, 19 from upper-middle income, 21 from lower-middle-income and 7 from lower- income countries. A mixture of both specific and ad valorem excises tax is being applied by 61 countries, 29 of them from higher income countries, 19 from upper-middle income, 11 from lower-middle-income and 2 from lower- income countries . Bangladesh needs to introduce specific tax on tobacco products, and the tobacco tax policy can set the guideline of introducing specific tax on tobacco products.

Export of tobacco products

In 2010-11, the government imposed a 10% export duty on tobacco leaf exports as a means of discouraging tobacco farming. In the budget of FY 2017-18, the government increased the export duty on tobacco items to 25%. Regrettably, this export duty was withdrawn in the budget of 2018. A policy is required to ensure that the export duty on tobacco leaf exports is imposed in Bangladesh.

Tax on tobacco cultivation and curing

Bangladesh is a tobacco cultivating country, and currently around 150,000 acres land are used for tobacco cultivation. The farmers choose to grow tobacco for more profitability of tobacco cultivation than other crops. A guaranteed ready market for tobacco, use of household members in cultivation, in-kind assistance from tobacco companies through the provision of free seeds, fertilizers, pesticides, and monetary benefits from companies in terms of providing loans and full payment for the products at once make tobacco cultivation lucrative for farmers. Tobacco farming puts people, especially children, at risk of nicotine poisoning, pesticide exposure from toxic chemicals applied to the crop, heat illness, and chronic pain and injuries from performing repetitive motions. Tax on cultivation and curing, and other measures can discourage the farmers to cultivate tobacco. Hence, the tobacco tax policy can ensure that tobacco farmers do not get any subsidy or tax exemption.

Illicit tobacco trade

In Bangladesh, illicit trades in cigarettes can be categorized largely into 3 types: counterfeit, contraband and illicit white. Counterfeit cigarettes are mostly cheap reproduction of cigarette brands, contraband cigarettes are smuggled and illicit whites are the cigarettes that are underreported by the tobacco companies with the aim of tax evasion. Counterfeit and smuggled biris are considered a rare occurrence in the tobacco market of Bangladesh. However, the major threat of illicit trade and tax evasion lies in the tendency to reuse the banderoles that are sold for single use. Biri companies use the banderoles several times to evade tax and due to the lack of information, the NBR seldom can take measures against it.

Most smokeless tobacco (SLT) products in Bangladesh e.g. zarda and gul are manufactured locally in informal establishments and remain outside of tax net. Similar to the biri market, the NBR does not have any organized database on the details of the SLT manufactures. Poor monitoring systems coupled with inadequate law enforcement results in further tax evasion and avoidance. A comprehensive tobacco tax policy is required to ensure that banderoles are not re-used, to penalize those engaged in illicit trade through suspension or revocation of license, ensure certain, swift, and severe penalties for those caught engaging in illicit trade in tobacco products, and ban retail sales of tobacco products through Internet-, telecommunication- or any other evolving technology-based modes of sale.

2 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019

Corporate social responsibility (CSR)

CSR refers to a self-regulating business model that helps a company be socially accountable—to itself, its stakeholders, and the public. Companies engage in CSR activities with the purpose of making positive contributions to the social, economic and environmental development of the society. Generally, tobacco companies partake in these activities to counterbalance the adverse impact they have on public health and the environment. Article 5.3 Guidelines of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) strictly prohibits philanthropic activities by tobacco companies in the name of CSR, stating that "The tobacco industry conducts activities described as socially responsible to distance its image from the lethal nature of the product it produces and sells or to interfere with the setting and implementation of public health policies. Activities that are described as "socially responsible" by the tobacco industry, aiming at the promotion of tobacco consumption, is a marketing as well as a public relations strategy that falls within the Convention's definition of advertising, promotion and sponsorship." In Bangladesh, a clear policy on CSR is required to define the scope of CRS that tobacco industry can avail legally, and that the industry is required to disclose their CSR activity, and provide information to appropriate authority about type of CSR activities, when the fund to be transferred and the amount.

Tax administration

The tax administration system in Bangladesh has several shortcomings. It is important to strengthen tobacco tax administration through introducing latest technologies to the system for tracking, tracing, monitoring and licensing of tobacco companies, and recording and reporting of tobacco production, distribution, sale and revenue collection. In addition, it is crucial to introduce advanced, sophisticated tax stamps and banderoles.

Way forward

In accordance with the honorable Prime Minister's commitment, the National Tobacco Control Cell and Health Economics Unit of the Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh can take the initiative to prepare a comprehensive Tobacco Tax Policy for Bangladesh to achieve the public health goal of reducing premature mortality and morbidity attributable to tobacco consumption in Bangladesh, and make the country tobacco free by 2040. Wide stakeholder consultation is required to make the policy context-specific and robust.

Importance of a Comprehensive Social and Behavior Change Communication Campaign in Making Bangladesh Tobacco-free by 2040

Dr. Shahida Haque, Advisor (Research and Evaluation),
and **Mohammad Shamimul Islam**, Deputy Director (Program), BCCP

Current Tobacco Scenario in Bangladesh:

Tobacco consumption in Bangladesh is an important public health problem causing more than 1,61,000 deaths each year (Tobacco Atlas 2018). The Global Adult Tobacco Survey 2017 showed that in Bangladesh, 37.8 million adults use any form of tobacco products: 19.2 million smokes while 22 million use smokeless tobacco. Additionally, 40.8 million were exposed to tobacco smoke at home; 8.1 million adults who worked indoors were exposed to tobacco smoke in enclosed areas at their workplace, and 25 million were exposed to tobacco smoke when using public transportation. Tobacco use is a major risk factor in Non-Communicable Diseases (NCDs) such as cardiovascular diseases (heart attack, stroke, etc.), cancers, and Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD). Fueling the persisting levels of tobacco use are the aggressive brand promotion by the Tobacco industries, the increasing trend of beguiling CSR initiatives, the deceptive economic support for tobacco cultivation, intense lobbying to prevent stronger law and higher taxes, and promotion of E-cigarettes as the new trend of glamour and smartness especially among the youth.

Vision and Ongoing Initiatives:

Our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's vision is to make Bangladesh Tobacco-free by 2040. Major initiatives taken by the National Tobacco Control Cell (NTCC) and the Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW) include: developing a Roadmap for Tobacco Control; further Amendments to the Tobacco Products Usage (Control) Act 2005 already revised in 2013; Graphic Health warnings on all tobacco products (including chewing tobacco); and a Five-year National Tobacco Control Program (NTCP) with a strong communication component. Ongoing efforts to curb tobacco use also include capacity building programs by NTCC/WHO and other organizations; conducting various types of studies to generate local evidence; developing and airing PSAs at the national levels; conducting media advocacy, especially to get earned media coverage; and undertaking local level campaigns especially around the tobacco taxation and World No Tobacco Day (WNTD).

Key Challenges for Tobacco Control Communication: It is proven that strategic communication plays a vital role in creating awareness, inducing behavior change and generating advocates for change. However, tobacco use is an addictive behavior which requires strategically designed comprehensive communication that will resonate with the audiences and motivate them with rational and emotional appeal. Key challenges for tobacco control communication exist at various levels. There is less than optimal involvement of political leaders at national and local levels; lack of comprehensive campaigns at national and regional levels; vertical or isolated communication efforts

with little integration; and inadequate capacity-building initiatives for program implementers. Communication approaches use a limited media mix to provide comprehensive information and there is not enough activation of community resources and participation of stakeholders to create an enabling environment. There are limited audience-specific and audio-visual materials with only few materials on smokeless tobacco/chewing tobacco. Advocacy and enter-educate materials are also lacking.

Comprehensive Social and Behavior Change Communication:

To achieve our 2040 vision, we need to develop and launch a comprehensive country-wide multi-media campaign to create a buzz in the community; using media mix to bring synergy into the programs and utilizing the power of Enter-educate programs to promote behavior change through role modeling. It is equally important to harness the national-level campaigns with the local ones, strengthen the communication capacity of all the stakeholders and mobilize the community for creating 100% smoke-free environment. Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) has vast experience in working with the government and other organizations to design and implement successful national and local level campaigns such as the Green Umbrella and Smiling Sun campaigns. BCCP follows a strategic framework that focuses on audiences at individual, community, institutional and policy levels; creating synergy through a comprehensive and coordinated media mix. BCCP has developed a wide range of communication strategies from the first ever FP-MCH IEC Strategy in 1993 to the latest Comprehensive SBCC Strategy being implemented by the MOHFW.

It is firmly believed that developing and implementing a comprehensive SBCC campaign will tremendously contribute to achieve the goal of the Honorable Prime Minister's commitment- making Bangladesh Tobacco-free by 2040.

Written by: Dr. Shahida Haque, Advisor (Research and Evaluation), BCCP and
Mohammad Shamimul Islam, Deputy Director (Program), BCCP

Tougher Tobacco Control Law is Essential For A Tobacco Free Bangladesh

Md. Hasan Shahriar*

Bangladesh has made a significant progress in tobacco control. Between 2009 and 2017, the tobacco use prevalence fell from 43.3 percent to 35.3 percent, showing a solid 18.5 percent relative reduction. This is a result of years of legislative and fiscal measures and cooperation between relevant government bodies and other anti-tobacco stakeholders. However, comparing the progress made by other South Asian neighbours (i.e., 28.6 percent of tobacco use prevalence in India as per GATS 2016 and 19.1 percent in Pakistan as per GATS 2014), Bangladesh's achievements often look dimmer.

A strong and time-fitting legislation sets the stage for the bolder and more effective measure. This is particularly true for tobacco control. Bangladesh has multi-faceted obligations to show utmost sincerity in battling tobacco pandemic. The obligation of safeguarding public health is one of the essential and sacred foundations of state policy, according to Article 18(1) of the Bangladesh's Constitution. 'The right to life' is likewise protected under the Article 32 of the Constitution. Bangladesh's government is also a signatory to the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) and has enacted tobacco control legislation in accordance with the Convention. Bangladesh's 8th Five-Year Plan (FYP) and the Sustainable Development Goals (SDGs) Target-3A both emphasize the necessity of implementing the FCTC. Apart from these aforementioned obligations, Bangladesh's Prime Minister in January 2016, has set the concrete target of making the country tobacco-free Bangladesh by 2040. Bangladesh's current developmental aspiration, to emerge as a developed nation by 2041, is also in conflict with the massive toll tobacco incurs on this nation. In FY 2017-18, the economic burden due to tobacco use (medical expense and loss of productivity) stood at BDT 30,560 crore which is much higher than the revenue earned from tobacco sector which is BDT 22,810 crore. Tobacco claims around 161,000 deaths in Bangladesh a year. It has been ranked as the fourth major contributing factor behind premature deaths in the country.

The findings of the 2009 and 2017 Global Adult Tobacco Survey also identified areas where legislative attention regarding tobacco control is lacking. While the Smoking and Tobacco Products (Usage) Control Act 2005 and subsequent amendment in 2013 banned advertisement and promotion of tobacco products, tobacco companies have adopted innovative tactics to take advantage of the loopholes and grey areas of the law. According to GATS 2017, almost 54% of the population have seen advertisements of cigarettes or bidis, while nearly 21% have seen some advertisement of jarda or gul (chewable tobacco). In the last 30 days predating the survey, 40%, 37% and 25% of the people have seen tobacco companies' advertisements, promotion, or sponsorship of cigarettes, bidis and smokeless tobacco products respectively. The invasive promotion of tobacco companies shows an increasing trend. The rate of people who saw advertisements of bidis rose by 22.5% between 2009 and 2017. In case of smokeless tobacco products, the rate of increase is 47.9%, which is highly alarming. We should keep in mind that these cheap tobacco products are mostly consumed by the low-income people and the women who are most susceptible to influence of advertisement. It is high time we amend the law to plug the hole by banning the display of tobacco products at the points-of-sale and increasing the area of Graphic Health Warning (GHW) on tobacco packs through an amendment.

Eliminating the existing law's provision for Designated Smoking Areas (DSAs) or "Smoking Zones" in public places and public transportation will go a long way toward ensuring that the tobacco control law's full advantages are realized. A 'smoking zone' in the middle of an otherwise smoke-free area does not protect people from second-hand smoke. As a result, such provision is incompatible with public health and obstructs the establishment of smoke-free zones in public places and public transit.

According to the 2017 Global Adult Tobacco Survey (GATS), 42% of all people who work in a covered place are regularly exposed to passive smoking. Passive smoking in public transportation is still a nightmare scenario. While using public transportation, about 25 million persons are exposed to second-hand smoke. The COVID-19 pandemic has reinforced the need to eliminate passive smoking once and for all, as second-hand smoke facilitates infection. 67 countries, including Thailand, Nepal, Turkey, and the United Kingdom, have already enacted full smoke-free legislation, which includes the total abolition of designated smoking zones.

Bangladesh's tobacco control efforts are hampered by the unpackaged sale of bidi, cigarettes, and smokeless tobacco products (jarda and gul). Loose sale makes tobacco products more available and affordable for vulnerable demographic, including adolescents, youth, and low-income population. Furthermore, when tobacco products are purchased loose rather than in packs, the Graphic Health Warning (GHW) on the packs is rendered utterly worthless. Article 11 of the FCTC also advises nations to prohibit the sale of single sticks or small packs of bidi-cigarettes, which has already been implemented by a total of 118 countries. There is growing need to address new threats on the horizon as manifested in the growing popularity of emerging tobacco products (ETPs).

The COVID-19 crisis should have called for stronger tobacco control measures. Unfortunately, the opposite happened as suggested by the evidences gathered in the 2021 Bangladesh Tobacco Industry Interference Index. Experience in recent years show how tobacco industry uses its so-called corporate social responsibilities (CSR) as a pretext to create deep liaisons with influential government bodies, which, in turn, are used to interfere and influence policymaking and implementation. A society where the policymaking sphere is vulnerable to tobacco industry's interference and influence is unable to adopt any meaningful tobacco control measure. So, any amendment to tobacco control law must completely ban tobacco industry's CSR activities.

* Head of Tobacco Control Program, PROGGA

Smoke free environment: Basic human rights

Sazia Binte Saleh, Program Officer (Consultant),
Initiative to Make Bangladesh Railways Tobacco- Free (IMBRTF) Project, Ministry of Railways

Exposure to tobacco smoke [known as second-hand smoke (SHS)] hazardous as smoking. Tobacco smoke contains more than 7000 chemicals, at least 250 of them are harmful and 70 are causes cancer (US Surgeon General Report 2014). SHS has been causally associated with a range of life-threatening health effects, including lung cancer and many serious respiratory and cardiovascular diseases in children and adults. The situation is particularly disturbing for children, cause of respiratory disease, middle ear disease, asthma and sudden infant death syndrome (SIDS)'. Just 30 minutes of SHS changes the way in which blood flows and clots, increasing the risk of heart attack and stroke.

Globally, SHS causes more than 1.2 million premature death in every year including 65,000 child death (WHO, 2019). Since 1980s, WHO warned countries about the danger of SHS and encourage smoke free workplace, public place, public transport and home. WHO highlighted SHS through World No Tobacco Day themes, such as, Public places & transport: better be tobacco free (1991); Tobacco free workplaces: safer & healthier (1992); Sport & art without tobacco: play it tobacco free (1996); SHS kills (2001); Tobacco free sports (2002), Smoke free inside (2007), Tobacco & Heart Disease (2018) and Tobacco & Lung Health (2019).

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adopted as first global public health treaty in 2003. At present, it is one of most widely adopted United Nations instrument that signed by 181 countries which cover more than 90% of the global population. FCTC reflected concern of SHS, recognized and acknowledged scientific evidence that SHS causes to death, disease and disability for all and troubled development conditions for children. Particularly, Article 8 of the FCTC encourage countries from protection from exposure to SHS. The 2nd Conference of the Parties (CoP2) of the WHO FCTC in 2007 adopted guideline on the implementation of the FCTC Article 8 that aimed to assist countries to meet the obligations on implementation of smoke-free measures. The United Nations included target 3a, as 'strengthen the implementation of the WHO FCTC in all countries, as appropriate' in the goal 3 (Health and Wellbeing for all) of the Sustainable Development Goals (SDG).

Protecting people from SHS is considered as fundamental human rights. The right to life recognized several international legal instruments including WHO Constitution, Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women and Convention on Economic, Social and Cultural Rights, as these also incorporated in the preamble of the WHO FCTC.

WHO **MPOWER policy package** launched in 2008 to accelerate implementation of the WHO FCTC in which **P** instances for 'Protect people from tobacco smoke' that aimed complete smoke-free environment in all indoor public spaces and workplaces.

In Bangladesh, smoking was discouraged in the train compartment in 1890 and banned in the show house (East Bengal Prohibition of Smoking in Show Houses Act 1952). The constitution of Bangladesh mandated improve public health as primary duty of the State in Article 18 and protected Right to Life in Article 32. SHS is directly linked with public health improvement and right to life. Smoking banned in any building or place occupied by government or local authorities in the metropolitan areas by the Dhaka Metropolitan Police Ordinance in late 1970s. Gradually, other Metropolitan Police Ordinance/Acts also banned smoking (MoHFW, 2005). The Motor Vehicle Ordinance 1983 prohibited smoking in any public service vehicles.

Bangladesh was first signatory to the WHO FCTC, and ratified it in 2004. Following the FCTC, Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act 2005 was passed that further amended in 2013 and Rules notified in 2015. This law banned smoking in many public places and public transports.

Public place defined as "educational institutions, Government, Semi-Government and non-government offices, offices of autonomous body, libraries, elevators, indoor workplaces, hospitals and clinics, court buildings, airport buildings, sea-port buildings, river-port buildings, railway station buildings, bus terminal buildings, ferry, cinema hall, exhibition center, covered showing place, theatre hall, shopping buildings, restaurants (covered and closed), public toilet, children park, fair and festivals or queue to get in the public transports, any other public places used by public or any or all places by the general or special order on time to time, by the Government, or local government. {2(cha)};

Public transport defined as "motor car, bus, train, trum, ship, launch, all kinds of mechanized public transport, aircraft and any other transport determined or declared by the Government by notification in the Official Gazette" {2(chha)}.

Smoking in public places and public vehicles is punishable offence and violator(s) could be fined up to 300 Taka. Owner/Caretaker/Controlling person or Manager of public place and transport is legally obligated to display no-smoking signage and could be fined 1000 Taka if they do not display 'no-smoking signage'.

The Government of Bangladesh implemented 7th Five Year Plan that made tremendous progress towards achieving United Nations Sustainable Development Goals (SDG) in which tobacco control was included. For the same reason, the 8th Five Year Plan has been also included the FCTC implementation as key instrument towards continuing the progress to achieve the SDGs.

Several study finds that many adults and youth were exposing SHS in various public places and transports. Such as, GATS 2017 data stated that among 15 years and above, 44% (25m) adults in public transports, 42.7% (8.1m) adults in indoor workplaces, 39% (40.8m) adults in home and 49.7% adults in restaurants were exposed to SHS. Among aged between 13 to 15 years old students, 61.3% boys and 54.8% girls in enclosed public places, 59.1% boys and 49.8% girls in outdoor public places and 31.1% students at home were exposed to SHS (GYTS 2013).

Number of studies identified tobacco as a major barrier for Bangladesh towards achieving the SDGs. According to Tobacco Atlas 2018, due to tobacco use and SHS, more than 161,000 people die in Bangladesh in a calendar year 2017-18. Bangladesh Cancer Society study in 2018 found that total health costs attributable to tobacco use and SHS was 305.6 billion BDT (1US$ = 84BDT) while revenue earned BDT 228.1 billion in the 2017-18 fiscal year. The costs due to SHS was 41.3 billion BDT.

With knowing present situation, the smoke free environment in any public place and transport is essential. Clean air or smoke free air is basic human right. Gradually, many countries banned smoking in public places and transports.

To ensure smoke free air in all public place and transport in Bangladesh, 100% smoke free environment is the best solution. Smoke-free provisions of law should be strengthened and removal of smoking zone from the public place and public transport essential. No smoking signage should be in place everywhere, in all public place and transport. All sorts of media and entertainment based medium (such as drama, cinema, social media etc.) should follow the law that banned the smoking scene. Ban on selling tobacco near to school should be in place to discourage the next generation for tobacco addiction.

অঙ্গিকার

মাহমুদ আলী খন্দকার
সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের
রক্তে গড়া আমার দেশ,
ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা
ছিলো সোনার বাংলাদেশ।
তামাক নামের মরন নেশা
দেশটা আমার করলো শেষ,
যুব সমাজ পঙ্গু হবে
টানতে হবে নেশার রেশ।

শখের বশে টানছো বসে
সিগারেটের নিকোটিন,
দিনে দিনে বাড়ছে দেনা
টঙ দোকানে টাকার ঋণ।
নেশার ঘোরে শরীর দোলে
ঝিমায় বসে রাত্রি-দিন,
যেমন করে ভুজঙ্গ দোলে
শুনে সাপুড়ের মরন বীণ।

যুবক তুমি ফিরে এসো
যুদ্ধে চলো আরবার,
নেশা ছেড়ে এই জমিনে
কলম করো হাতিয়ার।
নতুন দিনের সুর্য হয়ে
আলোয় ভরো বাতিঘর,
"নেশামুক্ত বাংলা গড়ি"
এই হোক তব অঙ্গিকার।

=== o ===

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধন) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫

১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ, ১লা চৈত্র, ১৪১১/১৫ মার্চ, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা চৈত্র, ১৪১১ মোতাবেক ১৫ই মার্চ ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এইআইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৫ সনের ১১ নং আইন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে

বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর;

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রর্বতন।– (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

[১](ক) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্ব পালনের জন্য কোন আইনের অধীন, বা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

---

[১] ধারা ২ এর দফা (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[২](খ) "তামাক" অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশ বিশেষ;

[৩](গ) "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "ধূমপান" অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে:

(ঙ) "ধূমপান এলাকা" অর্থ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

[৪](চ) "পাবলিক প্লেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) "পাবলিক পরিবহণ"অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

(জ) "বিধি"অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

[৫](ঝ) "ব্যক্তি" অর্থে কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩। অন্যান্য আইনের প্রয়োগ– এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে the Railways Act 1890 (act IX of 1890), the Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976), the Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord. No. XLV. III of 1978), the Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985 (Ord. No. LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), [৬]"সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সহ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।– (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না।

[৭](২) কোন ব্যক্তি উপ–ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

---

[২] ধারা ২ এর দফা (খ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৩] ধারা ২ এর দফা (গ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৪] ধারা ২ এর দফা (চ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৫] ধারা ২ এর দফা (ঝ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৬] ধারা ৩ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৩ ধারাবলে) "the Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben.Act, II of 1919); " বিলুপ্ত ও "এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), "সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সন্নিবেশিত
[৭] ধারা ৪ এর উপ ধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮]৫। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান ।– (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রমান্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমায় কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।

ব্যাখা- উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর (Corporate Social Responsibility) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবেন না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[৯]৬। অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ ।– (১) কোন ব্যক্তি কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়

---

[৮] ধারা ৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৯] ধারা ৬ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত ও ৬ক ধারাবলে সন্নিবেশিত

দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[১০]৬ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা– (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[১১]৭ক। পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, ইত্যাদির দায়িত্ব।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধির বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

[১২]৮। সতকর্তামূলক নোটিশ প্রদর্শন।– (১) ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৯। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা।– (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহীত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

---

[১০] ধারা ৭ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১১] ধারা ৭ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১২] ধারা ৮ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সংখ্যায়িত ও সন্নিবেশিত

[১৩]১০। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।-

(১) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিণ ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মূদ্রণ করিতে হইবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, করিতে হইবে, যথা:–

(ক) ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:–

(অ) ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়;
(আ) ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়;
(ই) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;
(ঈ) ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়;
(উ) পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;
(ঊ) ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(খ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:–

(ঋ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়;
(আ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সতর্কবাণী।

(৩) বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে বাংলাদেশে কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন, কৌটা বা মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন– লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত স্বচিত্র সর্তকবাণী এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিবৃতি তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় মূদ্রণ পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

১১। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।– (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

---

[১৩] ধারা ১০ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৪]১২। তামাক ও তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।–তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। জনসেবক।– কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) Gi section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য।– (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন সকল অপরাধ–

(ক) আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে;

(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

১৫। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।– [১৫](১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

[১৬](২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী কোন আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

[১৭]১৫। (ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন "জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল" নামে একটি সেল থাকিবে।

(২) উক্ত সেলের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ।– এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) থাকিবে:

–তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

---

[১৪] ধারা ১২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৫] ধারা ১৫ (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে সংখ্যায়িত

[১৬] ধারা ১৫ (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১১ ধারাবলে সংযোজিত

[১৭] ধারা ১৫ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত

১৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।–(১) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে –

[১৮](ক) The Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben.Act, II of 1919);

[১৯](কক) The East Bengal Prohibition of Smoking in Show House Act, 1952 (E.B. Act XIII of 1952); এবং

(খ) তামাকজাত সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৪৫ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনসমূহের অধীন কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ড. মো. ওমর ফরুক খান
সচিব

---

[১৮] ধারা ১৮ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১৯] ধারা ১৮ (কক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২৩, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ৯ চৈত্র ১৪১১/২৩ মার্চ ২০০৫

এস, আর, ও নং ৭১-আইন/২০০৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা ১২ চৈত্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ মার্চ, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ তারিখকে উক্ত আইন কার্যকর হইবার তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সচিব

মোঃ নুর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেঁজগাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
(১০৮৯)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৫৮-আইন/২০১৫।- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।- আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ বর্ণিত "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-

(ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(খ) সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(ঘ) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এ কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর;

(ছ) অগ্নি নির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; এবং

(জ) কারখানা পরিদর্শক।

৪। ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি।– (১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা:-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে;

(গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন;

(ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে;

(ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে;

(চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে;

(ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট;

(জ) শিশুপার্ক;

(ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং

(ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

(২) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইলে উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

(৩) একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী, ইত্যাদি হইলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাইবে, তবে–

(ক) উক্ত স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পিছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হইতে হইবে;

(খ) উক্ত স্থানটি যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

৫। সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান।– (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় "ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে;

(খ) টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় "ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া "ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

৬। ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা।– আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন করিতে হইবে, যথা:-

ক) ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে;

খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাহাতে ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া প্রবেশ করিতে না পারে উহা নিশ্চিত করা;

গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানিসহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা করা;

ঘ) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া যাহাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত করিতে না হয় উহা নিশ্চিত করা।

ঙ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৭। পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দায়িত্ব।- আইনের ধারা ৭ক এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে ধূমপানমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা:-

(ক) ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোন ছাইদানি রাখা যাইবে না;

(গ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করিলে, ক্ষেত্রমত, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অথবা উক্ত এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান না করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন;

(ঙ) দফা (ঘ) এর বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, তাহাকে কোন প্রকার সেবা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।– আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্নবর্ণিত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রবেশপথে এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাইজ হইবে অন্যূন ৪০ সেন্টিমিটার, ২০ সেন্টিমিটার;

(গ) সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সতর্কতামূলক নোটিশের নমুনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।-

(১) আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙ্গিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত ইত্যাদি সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল মুদ্রণ করিতে হইবে;

(খ) "পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে;

(গ) সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেকট্রনিক ফাইল সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঘ) সচিত্র সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখার অনুপাত হইবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে হইতে হইবে;

(ঙ) উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লিখিত সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে;

(চ) সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় এবং উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সরকার সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধি কার্যকর হইবার সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর হইতে সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত প্যাকেট, কৌটা এবং মোড়ক ব্যতিত কোন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে বিবৃতিটি সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে মুদ্রণ করিতে হইবে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ১২ (বার) মাস পর হইতে এই বিধান কার্যকর হইবে।

১০। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।- তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজত। - (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(শাহনাজ সামাদ)
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধন) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর আলোকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্ক বার্তাসমূহ

(বিড়ি-সিগারেটের জন্য ৭টি ও জর্দা-গুলের জন্য ২টি)

ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়

ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়

ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়

ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়

ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়

তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়

তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

আমার টাকায় আমার সেতু
বাংলাদেশের পদ্মা সেতু

বহুল প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের
পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ

ধারা	বিষয়	ভঙ্গকারী	জরিমানা
৪	পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ	ব্যক্তি	৩০০ টাকা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৫	তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ	**তামাক কোম্পানি, দোকানদার/ব্যবসায়ী**	**৩ মাসের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ**
৬	অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি ও ব্যবসায়ী	৩ মাসের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৬ক	**অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ**	**তামাক কোম্পানি, দোকানদার/ ব্যবসায়ী**	**৫০০০ টাকা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ**
৭	ধূমপানের এলাকা	**প্রতিষ্ঠানের মালিক/ কর্তৃপক্ষ**	৫০০ টাকা
৮	**নো- স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন**		**১০০০ টাকা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ**
১০	তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৫০% স্থানজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন	**তামাক কোম্পানি, দোকানদার, ব্যবসায়ী**	**৬ মাসের জেল ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ**

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আনসারী ভবন (চতুর্থ তলা)
১৪/২, তোপখানা রোড, ঢাকা - ১০০০
টেলিফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৫৫১৩৫
ইমেইল: info@ntcc.gov.bd; ntcc_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ntcc.gov.bd